# কিছু কথা
# কিছু ব্যথা

রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্ণেল (অবঃ) শরীফুল হক ডালিম (বীর উত্তম)

www.nagorikpathagar.org

## জীবনী

১৯৪৬ সালে জন্ম। বি. এস. সি গ্রাজুয়েট। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর তিনি বিমান বাহিনী থেকে সেনা বাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত পাকিস্তান সেনা বাহিনীতে কর্মরত থাকেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতেই সুদূর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে যে দলটি সর্ব প্রথম মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল তিনি ছিলেন তাদের একজন। মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ সাহস ও কৃতিত্বের জন্য তিনি বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত হন। একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় তার অবদান উল্লেখযোগ্য। শেখ মুজিবের স্বৈর শাসনকালে ১৯৭৪ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নং ৯ (PO-9) এর প্রয়োগে তিনি চাকুরিচ্যুত হন। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পর তাঁকে পুনরায় সেনা বাহিনীতে নিয়োগ করা হয় এবং লেঃ কর্ণেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। ১৯৭৬ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত হবার পর গণচীনে তাঁকে কূটনীতিক হিসাবে প্রেরন করা হয়। ১৯৮০ সালে লন্ডনের হাই কমিশনের সাথে তিনি এ্যাটাচ্‌ড হন। ১৯৮২ সালে কমিশনার হিসাবে হংকং এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রদূত হিসাবে কেনিয়ায় পোস্টেড হন। একই সাথে তাঁকে তানজানিয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়। ইউনেপ (UNEP) এবং হেবিটাট (HABITAT) এ বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। সোমালিয়ায় যুদ্ধকালিন সময়ে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা বাহিনীর অংশ হিসাবে প্রেরিত বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সদস্যদের সার্বিক তত্ত্বাবধানের বিশেষ দায়িত্বও তিনি পালন করেন। ১৯৯৫ সালে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর লাভ করেন। এরপর দেশে ফিরে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেন। তিনি বিবাহিত এবং এক কন্যার জনক। তার শখ হল বই পড়া, ভ্রমন, খেলাধুলা এবং সঙ্গীত।

রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্ণেল (অবঃ)
শরিফুল হক ডালিম (বীর উত্তম)

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# কিছু কথা কিছু ব্যথা

রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্নেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম বীর উত্তম

নব জাগরন প্রকাশনী
ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

# কিছু কথা কিছু ব্যথা

রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্নেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম বীর উত্তম

প্রকাশক

খন্দকার জামান

নবজাগরন প্রকাশনী, ঢাকা

৪৩৫-এ/২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রকাশ কাল

১লা ফেব্রুয়ারী ২০০২

বাংলা একাডেমির বই মেলা।

কম্পিউটার কমপোজঃ হিমু

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ ফরিদা চৌধুরী

ওয়েভ সাইটঃ

www.majordalim.com

www.majordalimbangla.com

E-mail: nobo_jagoron@yahoo.com

ISBN: 984-884-000-0

মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা

Prise: US $ 3.5; £ 2.5

---

প্রাপ্তি স্থানঃ

- আহসান পাবলিকেশনঃ ৩৮/৩ বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ১৯৩ ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০, ফোনঃ ৯৩৪৪৮৩৬, ০১৭ ৩৭১১৭১।
- তাসনিয়া বই বিতানঃ ৪৯১/১ ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
- বুক ভিউঃ নিউ মার্কেট, ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

ঐ সব সহযোদ্ধাদের
যাদের হারিয়েছি এবং
যারা আজো বেঁচে আছে
তাদের স্মরণে
কিছু কথা কিছু ব্যথা
উৎসর্গ করলাম

www.nagorikpathagar.org

## সূচীপত্র

আব্বা আপনাকে সালাম - ৬
যদি তুমি অমর - ১৪
কমরেডশীপ - ১৮
বয়রায় এক রাত - ২৩
আজাদ ফিরে আসবে - ২৭
মাইক তোমাকে ভুলবনা -৩১
বীরাঙ্গনা কোহিনুর - ৩৭
গোজাডাঙ্গার না ভুলা স্মৃতি - ৪৩
ধামাই অপারেশন - ৪৯
মৃত্যুর মুখোমুখি - ৫৩

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# আব্বা আপনাকে সালাম

# ৭৭



www.nagorikpathagar.org

# ৩

মরহুম আলহাজ্ব শামছুল হক আমাদের শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ঢাকার কেরানীগঞ্জে এক বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত পরিবারে বিশের দশকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমার দাদা আলহাজ্ব মৌলভী শরাফত আলী আমাদের এলাকায় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট।

আব্বা মেধাবী ছাত্র হিসেবে বৃত্তি পেয়ে পড়াশুনা করেছেন স্কুল জীবন থেকেই। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি জীবনে ডিবেট, খেলাধুলায় যথেষ্ট নাম ছিল তার। ছাত্র জীবনেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। ১৯৪৪-৪৬ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সাধারণ সম্পাদকের পদে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার মুসলমান ছাত্র সমাজ ঐতিহ্যগত কারণেই পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে আব্বা সরকারি চাকুরীতে যোগ দেন। দেশ বিভক্তির পর ১৯৪৭ সাল থেকেই ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টের একজন প্রতিষ্ঠাতা কর্মকর্তা হিসাবে ঐ ডিপার্টমেন্ট এর সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

ধর্মীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আব্বা। তাই স্বাভাবিক কারণেই ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল তার ছোটকাল থেকেই। ধর্মীয় বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন বিস্তর পড়াশুনা করে। কিন্তু ধর্মীয় গোড়ামি তাকে স্পর্শ করতে পারেনি কখনো। ৭/৮ বছর বয়স থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করেননি তিনি। ইসলামী জীবনাদর্শকে সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করেছিলেন আব্বা। জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অতি আধুনিক ও যুক্তিসঙ্গত। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে তিনি আল্লাহ্‌র অসীম নিয়ামত মনে করতেন। অত্যন্ত স্পর্শকাতর উদারপন্থী এবং জনদরদী ছিলেন আব্বা। জীবনের সব অবস্থানে থাকাকালীন অবস্থায় মানুষের কল্যানার্থে বিশেষ করে আমাদের এলাকার অনগ্রসর জনসমষ্টির কল্যান প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন আমার দাদা এবং আব্বা। তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য আজীবন সচেষ্ট থেকেছেন তারা নিঃস্বার্থভাবে। তাদের প্রচেষ্টায় আমাদের এলাকার প্রায় প্রতিটি পরিবার কোন না কোনভাবে উপকৃত হয়েছে। আব্বার দ্বার অবারিত থাকত সবার জন্য। গ্রামের সবাই


www.nagorikpathagar.org

তাদের সুখ-দুঃখে তার শরণাপন্ন হতে পারতো নির্দ্বিধায়। সরকারি পদস্থ অফিসার হয়েও জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন সর্বদাই সচেতন। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে জড়িত তৎকালিন প্রথম সারির ছাত্রনেতা জনাব সাদেক খান, আলাউদ্দিন আল আজাদসহ আরো অনেকেই হুলিয়া, পুলিশি নির্যাতন ও হয়রানির হাত থেকে বাচাঁর জন্য আমাদের মালিবাগের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে লুকিয়ে থেকেছেন মাসের পর মাস। তাদের সংগ্রামে আব্বা ও আম্মাকে দেখেছি বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে। সেকালে পদস্থ একজন সরকারি চাকুরের জন্য এ ধরণের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকা ছিল অত্যন্ত ঝুকিঁপূর্ণ।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথমার্ধে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি। আমার ছোট ভাই কামরুল হক (স্বপন) বীর বিক্রম ছাত্রাবস্থায় যোগ দেয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। আমাদের দুই ভাইয়ের দেশদ্রোহিতার খেসারত দিতে হয়েছিল আব্বাকে। নানাভাবে তাকে হেস্তনেস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত কিছুই মুখবুঝে সহ্য করেছিলেন আব্বা। ক্যান্টনমেন্টের সামরিক কর্মকর্তাদের মোকাবেলা করেছিলেন অতি সাহসিকতার সাথে। আমাদের মালিবাগের বাসা তখন ঢাকা শহরে মুক্তিফৌজদের একটি বিশেষ ঘাঁটি ও অস্ত্রাগার। কিন্তু দৃঢ় চরিত্রের আব্বার কাছ থেকে এ সমস্ত ব্যাপারে খানসেনারা কোন তথ্যই সংগ্রহ করতে পারেনি। তার প্রতিজ্ঞায় তিনি অটল। চাপের মুখে মচ্‌কাবেন না কখনও, এতে মৃত্যু হয় হউক। আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিতেন, "আমার ছেলে পশ্চিম পাকিস্তানে চাকুরী করছে সেটাই আমি জানি। তোমাদেরই বলা উচিত সে কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে? ওর সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করছো কোন যৌক্তিকতায়?" স্বপন সম্পর্কে আব্বা বলতেন, "স্বপন সাবালক। তার গতিবিধির উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রন নেই।" তবুও শেষ রক্ষা হল না। আমাদের পরিবারের উপর বিপর্যয় নেমে এল।

২৯শে আগষ্ট ১৯৭১। কিছুদিন যাবত বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। রাজধানী ঢাকায় স্বপনদের গেরিলা তৎপরতা বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। একের পর এক গুলবাগ পাওয়ার ষ্টেশন, ফার্মগেট অপারেশন, যাত্রাবাড়ি অপারেশন, ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে বিষ্ফোরন,


www.nagorikpathagar.org

সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশন ও গ্রীণরোডের সাড়া জাগানো অপারেশনের ফলে স্বপনরা খানসেনাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে।

এই অবস্থায় আরো বড় আকারের অপারেশন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ওরা। এর জন্য সাচো মানে বিচিত্রার শাহদাত চৌধুরী ও আলমকে পাঠানো হয়েছে মেলাঘরে মেজর খালেদ ও ক্যাপ্টেন হায়দারকে বুঝিয়ে রাজি করে কিছু ভারী হাতিয়ার ও বেশি পরিমাণে এক্সপ্লোসিভ আনার জন্য। ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত স্বপনরা সবাই যাত্রাবাড়ি বেইসক্যাম্প-এ অবস্থান করবে এটাই ঠিক করা হয়। বেইসক্যাম্প-এ যাবার আগের রাত মানে ২৯শে আগষ্ট ওরা সবাই যার যার পরিবারের সাথে রাত্রি কাটাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

কাজি, সামাদ, জুয়েল, আজাদ, রুমি ওরা সবাই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে রাতে যার যার বাসায় অবস্থান করছে। স্বপনও এসেছে মালিবাগে রাত কাটাতে। স্বপনের আসার খবর পেয়ে আমার দুই ফুফাতো বোন বুলু ও মুন্নিও এসেছে আমাদের বাসায় মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনার নেশায়।

সেদিন দুপুরেই জনাব জিল্লুর রহমানের (বর্তমানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) শ্যালক ফরিদের বিশ্বাসঘাতকতায় বদি ফরিদদের বাসা থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে গ্রেফতার হয়ে যায়। ধরা পরে সামাদও। এ খবর বাকি কেউই জানতে পারেনি। ওদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে খানসেনারা জানতে পারে সে রাতে দলের সবাই যার যার বাড়িতে রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত।

স্বাধীন বাংলাদেশের নব্য মীরজাফদের জ্বলন্ত উদাহরণ- ফরিদ। তার ন্যক্কারজনক বিশ্বাসঘাতকতায় আল্লাহর আরশও কেঁপে উঠেছিল। স্বাধীনতার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অত্যধিক মদ্যপান এবং উঃশৃঙ্খলতার জন্য অতি করুণভাবে মৃত্যু ঘটেছিল ফরিদের।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। বিকেল থেকেই বৃষ্টি ঝড়ছে একনাগাড়ে। বাসার লনে পানি জমে গেছে। সবার সাথে গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেছে। আব্বা বললেন, "রাত অনেক হয়েছে। স্বপনকে rest করতে দাও।" সবাই আব্বার আদেশে শুতে চলে গেল। স্বপন তার নিজের ঘরে না গিয়ে ড্রইং রুমে কি কারণে কার্পেটেই শুয়ে পড়ল। রাত প্রায় ১টা কি ২টা হবে হঠাৎ ভারী জুতোর আওয়াজে আব্বার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আন্টিও জেগে



www.nagorikpathagar.org

উঠলেন। বাড়ির চারদিকে কান্না যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। জানালার পর্দা ফাঁক করে আব্বা দেখলেন পুরো বাড়ি আর্মিতে ভরা। মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন, বাড়ি রেইড করা হয়েছে স্বপনকে ধরার জন্য। তিনি আন্টিকে বললেন, "জলদি স্বপনকে জাগিয়ে তাকে বের করার বন্দোবস্ত কর। আমি যতক্ষণ পারি ওদের বাসার ভেতর প্রবেশ পথে বাধাঁর সৃষ্টি করছি।" তড়িৎ গতিতে আন্টি ড্রইং রুমে ছুটে গেলেন। ইতিমধ্যে দরজায় মুহুমুহু আঘাত পড়তে শুরু করেছে, কেউ একজন চিৎকার করে বলছে - "দরওয়াজা খোলো"। হৈচৈ শুনে স্বপনও জেগে উঠেছে। অবস্থার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্বপন বিছানায় বসে ভাবছে কি করা উচিত? আন্টি এসে জানালো আর্মি রেইড করেছে। সারা বাড়ি ছেয়ে গেছে খানসেনায়। তিনি স্বপনের হাত ধরে তার বেডরুমের attached bathroom এর পেছনের দরজা খুলে দিয়ে বললেন, "পালিয়ে যাও।"

স্বপনের পরনে লুঙ্গি আর গায়ে লাল কুর্তা। এক মুহূর্তের ইতঃস্ততা। স্বপন ভাবলো সে পালিয়ে গেলে বাড়ির অন্য সবার কি হবে? আন্টি তার মনের কথা বুঝি বুঝতে পারলেন! বললেন, "পালিয়ে যাও। আমরা ম্যানেজ করব।" তার কথায় স্বপন এক দৌড়ে পাচিঁল টপকে অন্ধকারে মিশে গেল। তাকে পালাতে দেখে আর্মি এলোপাথারী ফায়ারিং শুরু করল। কিন্তু স্বপন গুলি ও খানসেনাদের বেষ্টনী ভেদ করে অন্ধকারে বাসার পেছনের বস্তিতে পালিয়ে যেতে পেরেছে ততক্ষণে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

স্বপনের চলে যাবার পর আব্বা দরজা খুলে দিলেন। ঢুকল একজন ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন বন্দুকধারী খানসেনা। ভেতরে ঢুকেই ক্ষুধার্ত হায়নার মত প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাবার চেষ্টা করল স্বপনকে। কিন্তু কোথাও নেই স্বপন। এটা কি করে সম্ভব!

-স্বপন কিধার হ্যায়? রাগে ফেটে পড়ল একজন। আব্বা বললেন,

-স্বপন এখানে নেই।

-ও লাল কুর্তাওয়ালা কোউন থা? প্রশ্ন আবার।

-কোউন লাল কুর্তাওয়ালা? পাল্টা প্রশ্ন করলেন আব্বা।

-ওহি যো ভাগগিয়া। চুপ করে রইলেন আব্বা।

-ওহি স্বপন থা। বলল একজন। কে একজন হঠাৎ আন্টিকে দেখিয়ে বলে উঠল,



www.nagorikpathagar.org

-ইয়ে অওরাত্ত উস্ লাল কুর্তাওয়ালাকো ভাগা দিয়া।

-কিউ ভাগা দিয়া তুমনে উস্কো? ও কোন থা? তার হুংকারে সবাই ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু আন্টি ঘাবড়ালেন না এতটুকু।

-ও মেরা ল্যারকা থা। আগার উস্কো ভাগা দিয়া তো মা হোকে ম্যায়নে ঠিকই কিয়া। আন্টির এই জবাব শুনে থমকে গেল সবাই। সাহস কত মেয়ে লোকটার! বলছে কিনা ভাগিয়ে দিয়ে ঠিকই করেছে। হঠাৎ ক্যাপ্টেন ড্রইংরুমে ষ্ট্যান্ড এ রাখা আমার ইউনিফর্ম পরিহিত একটি ছবি তুলে নিয়ে আব্বাকে বলল,

-এটা কার ছবি? আব্বা বললেন,

-আমার বড় ছেলের। মুহুর্তে সমস্ত অবস্থাই গেল পাল্টে। ক্যাপ্টেন ঘর থেকে সমস্ত খানসেনাদের বাইরে যাবার হুকুম দিল। সবাই চলে গেলে ও আব্বাকে বলল,

-চাচাজান, শরিফ অর ম্যায় coursemate হু। PMA মে একই company মে থে হাম দোনো। মুঝে পাতা নেহি থা স্বপন উস্কা ভাই হ্যায়। যো হোগিয়া ওতো হোগিয়া। লেকিন আব আপ বেফিকির রাহিয়ে। আপ লোকগো কুচ নেহি হোগা। লেকিন চাচাজান আপ অর বাকি malemembers of the house কো মেরা সাথ ক্যান্টনমেন্ট যানা পারেগা।

একথা শুনে আমার বোনেরা সবাই ডুকরে কেঁদে উঠল। ক্যান্টনমেন্ট যাওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু। তাদের স্বান্তনা দিয়ে ক্যাপ্টেন কাইউম কেয়া, মহুয়াদের বলল,

-বেহেনো রোনা নেহি, রোও মাত। চাচাজানকো কুচ নেহি হোগা; ম্যায় ওয়াদা কারতাহু। লেকিন উন্কো লেযানা বহুত জরুরী হ্যায়। সবাই বুঝলো এ ব্যাপারে আর কিছুই করার নেই। কাইউম আব্বা ও অন্যান্য পুরুষদের সবাইকে নিয়ে চলে গেল।

ক্যান্টনমেন্টে গোয়েন্দা বিভাগের কর্নেল তাজ ও কর্নেল হেজাজী অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। কাইউম পৌঁছাতেই প্রশ্ন করলেন,

-স্বপন কিধার হ্যায়? ক্যাপ্টেন কাইউম জবাব দিল,

-স্বপন মিলা নেহি।

-what? গর্জে উঠলেন কর্নেল তাজ।

-স্বপন ঘরপর নেহি থা। কাইউম মিথ্যে জবাব দিল। বন্দি সবার দিকে চোখ ঘুরিয়ে কর্নেল হেজাজী ক্যাপ্টেন কাইউমকে বলল,



www.nagorikpathagar.org

-Where are the daughters? Why did you not bring them?

-Well, that was not my order Sir. জবাব দিল কাইউম।

-Go and get them all. হুকুম দিলেন কর্নেল তাজ। আব্বা নিশ্চুপ দাড়িয়ে সবকিছুই দেখছিলেন ও শুনছিলেন। প্রমাদ গুনলেন তিনি। এখন কি হবে? কি করে মেয়েদের বাচাঁনো যায়। তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। অসহায় আব্বার দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। মনে মনে আল্লাহর স্মরনাপন্ন হলেন তিনি। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটল। ক্যাপ্টেন কাইউম কর্নেল তাজকে লক্ষ্য করে দৃঢ়তার সাথে বলে উঠল,

-Sir I can't do this job. Please send somebody else.

-You are disobeying order. গর্জে উঠে রাগে ফেটে পড়লেন কর্নেল তাজ।

-Well, in whatever way you may take it, I can't go to get the daughters. I am sorry sir. বলল কাইউম। কথা কাটাকাটি চরমে পৌছার আগেই কর্নেল হেজাজী বলে উঠলেন,

-Nevermind, Taj we shall find someone else to do the job, that's no problem. তাজের কথার জবাব দিয়ে বিদায় নিয়ে ক্যাপ্টেন কাইউম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গিয়েই ফোন করে বাসায় জানিয়ে দিল খানসেনারা আসছে মেয়েদের ধরে নিয়ে যেতে। অতএব কালবিলম্ব না করে সবাই যেন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কাইউমের কাছ থেকে টেলিফোন পেয়ে সেই মুহুর্তেই বাড়ির সবাই পালিয়ে গেল।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আর্মির দুই ট্রাক ভর্তি সৈন্য এল মালিবাগের বাসায়। কিন্তু বাসায় তখন কেউই নেই। কাউকে না পেয়ে তারা সমস্ত বাড়ি লুট করে ফিরে গেল। গাড়ি থেকে শুরু করে জানালার পর্দা পর্যন্ত কিছুই বাদ পরলো না। ঝাড়বাতিগুলো পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়েছিল তারা। যা কিছু নেয়া সম্ভব হয়নি সেগুলো ভেঙ্গেচুড়ে আক্রোশ মিটিয়ে নিয়েছিল হিংস্র হায়নার দল।

কিন্তু পাকিস্তান আর্মির সবাই একরকম ছিল না। ক্যাপ্টেন কাইউমের বিবেকের তাড়না ও মানবিক চেতনা বাচিঁয়ে দিয়েছিল আমার মা-বোনদের ইজ্জত। তার বন্ধুত্বের এ ঋণ শোধ দেবার সুযোগ হয়ত কখনোই পাব না আমি। তবে আল্লাহ্‌পাকের কাছে আমরা সবাই সর্বদাই দোয়া করি, "আল্লাহ যেন তাকে এবং তার পরিবারকে হেফাজতে রেখে



www.nagorikpathagar.org

তাদের মঙ্গল করেন।" ক্যাপ্টেন কাইউম যেখানে যে অবস্থাতে থাকুক না কেন তার প্রতি আমার ও আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের দোয়া থাকবে আজীবন।

মানুষের প্রতি আব্বার আন্তরিক বাৎসল্য ও সেবার প্রতিদান আমাদের এলাকাবাসী দিয়েছিল প্রতিদানে। ১৯৭৯ সালে তৎকালিন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সবিশেষ অনুরোধে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। কেরানীগঞ্জ থেকে সংসদ প্রার্থী হয়ে নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেন। তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের মত দলও তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল নিজেদের মুখ বাঁচাবার জন্য। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় থাকাকালীন সময় সংগঠিত হয়েছিল নির্বাচন। কোনপ্রকার নির্বাচনী প্রচারণা ছাড়াই তিনি কেরানীগঞ্জ থেকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়ী হন। ব্যাক্তিগতভাবে তিনি সর্বোচ্চ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের মানুষ গরীব হতে পারে; তারা অশিক্ষিত হতে পারে কিন্তু তারা অবশ্যই সচেতন। সত্যা-মিথ্যার যাঁচাই তারা অবশ্যই করতে পারে। যারা তাদের অবহেলা করে অবজ্ঞাভরে বলে বেড়ায় - বাংলাদেশের মানুষ অসৎ কিংবা পচেঁ গেছে তারা অবশ্যই গণমানুষের কথা বলে না। কারণ আপামর জনসাধারণের সাথে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। তারা বলে থাকে পরিবেষ্টিত টাউট-বাটপারদের, ফরিয়া-দালালদের কথা। এরা সবাই সমাজের পরগাছা। স্বর্ণলতিকার মত সমাজের উচুস্তরে অবস্থিত এ সমস্ত পরগাছাদের জঞ্জাল সমূলে উৎপাটন করে সুস্থ্য ও সমৃদ্ধ জাতি এবং দেশ গড়ে তোলাই আজ আমাদের প্রতিটি সচেতন দেশপ্রেমিক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। আমাদের এ দায়িত্ব নিঃস্বার্থহীনভাবে যেকোন ঝুঁকির বিনিময়ে কতটুকু করতে পারব তার উপরেই নির্ভর করবে আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যত। এ কঠিন বাস্তবতার কোন বিকল্প নেই।


www.nagorikpathagar.org

# বদি তুমি অমর

# ৭৭



www.nagorikpathagar.org

# ৫

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে দুপুর ১২টায় তেজকুনিপাড়া ছাড়িয়ে তৎকালিন সংসদ ভবনের কাছে আর্মি ইন্টিলিজেন্সের একটি সেফ হাউজের কাছে একটি থ্রি টন লরি এসে থামল। সঙ্গে রয়েছে আর্মি স্কট। গাড়ি থেকে নামানো হল বিভিন্ন বয়সের ৬০/৭০জনকে। সবার অবস্থাই মুমুর্ষ। ঠিকমত হাটতে পারছে না কেউই। রুটিনমাফিক সকালের interogation শেষে ফেরত পাঠানো হয়েছে তাদের। রোজ দু'বেলা চালানো হয় interogation এর নামে পাশবিক অত্যাচার। উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধ ও গেরিলাদের তৎপরতা সম্পর্কে খবর বের করা।

আব্বা ও রয়েছেন এদের সাথে। বেচারা বয়স্ক মানুষ অত্যাচারের মাত্রা সইতে না পেরে বেহুশ হয়ে পড়েছেন প্রায়। বদি অতিকষ্টে নিজের দুর্বল ও বেদনায় জর্জরিত শরীর নিয়েও আব্বাকে প্রায় কাঁধে বয়ে নিয়ে সেলে এল। সেলের একপ্রান্তে ছোট্ট একটা পানির নালকা। বাকি সবাই সেলে ঢুকেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রনায় কাতঁরাতে লাগল। কেউ কেঁদে উঠল ভেউ ভেউ করে। কেউ অসহ্য পিটুনিতে কুঁকড়ে পড়ে গোঙ্গাতে থাকল নিতান্ত অসহায়ভাবে। বদি তার সব যন্ত্রনা সহ্য করে টেপ থেকে পানি এনে আব্বার শুশ্রষা করতে লাগল অতি যত্ন সহকারে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি দেখলেন বদি তার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বসে আছে। বেদম মারের চোটে বদির চোখের নিচে কালশিট পড়েছে। ঠোট ফেটে ফুলে উঠেছে। হাত-পায়ের বিভিন্ন জায়গায় জমাটবাধাঁ রক্তের দাগ। ওর উপরই সবচেয়ে বেশি অত্যাচার চালাচ্ছে পাকিস্তান আর্মির গোয়েন্দা বিভাগ। কারণ বন্দিদের মাঝে একমাত্র বদিই মুখ খুলছে না। সব অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করে যাচ্ছে নিশ্চুপ থেকে। অত্যাচারী খানসেনারাও তার সহ্যশক্তি দেখে হতবাক হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই বদি ওদের কাছে পরিণত হয়েছে কিংবদন্তীর এক নায়কে। ঢাকার বাইরে থেকে পদস্থ অফিসাররা যারাই আসছেন তারাই এই অসীম সাহসী বদিকে একনজর দেখে যাচ্ছেন। তাদের সবার একই প্রশ্ন - কি ধাতুতে তৈরি এই মুক্তিযোদ্ধা?



www.nagorikpathagar.org

অত্যাচারের সব তরিকা অবলম্বন করেও তার কাছ থেকে একটি কথাও বের করা সম্ভব হয়নি। আশ্চর্য্য মনোবল ও অবিশ্বাস্য সহ্য শক্তির অধিকারী এই ছেলেটির ভবিষ্যত সম্পর্কে ভেবে আতংকিত হয়ে পড়ছিলেন আব্বা। তার দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল।

উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের ঢাকা ভার্সিটির ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র বদি। আব্বা এবং বদির বাবা একসাথে লেখাপড়া করেছেন। বরাবর ষ্ট্যান্ড করা ছেলে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে তুচ্ছ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের আহুতি দিতে চলেছে। এতটুকু ক্ষেদ নেই। নেই কোন অনুশোচনা। ইস্পাতকঠিন চারিত্রিক দৃঢ়তায় আব্বা এবং বন্দিদের সবাই হতবাক হয়ে তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করছে তার সার্বিক মঙ্গলের জন্য। আব্বা চোখ মেলে তাকালেন। আব্বাকে চোখ মেলতে দেখে বদি মৃদু হেসে বলল,
-চাচা, কেমন বোধ করছেন? ওরা আমাদের অত্যাচার করে সেটা সহ্য হয় কিন্তু আপনার উপর অযথা অত্যাচার সেটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। এটা শুধু অযৌক্তিকই নয়; এটা ঘোরতর অন্যায়। আমিও আর সহ্য করতে পারছি না। কিছু একটা করতে হবে এ অমানুষিক যন্ত্রনার হাত থেকে মুক্তি পেতে। অনেকটা স্বগোক্তিই যেন করল বদি।

পরদিনই ঘটল ঘটনা। সেন্ট্রিরা এসেছে বন্দিদের ইন্টেরোগেশনের জন্য নিয়ে যেতে। সবাই গিয়ে উঠে পড়েছে ট্রাকে। হঠাৎ বদি একজন প্রহরীর হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে অপারগ হয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করল। কড়া পাহারার নিয়ন্ত্রনে এ বন্দিশালা থেকে পালাবার কোন পথই নেই। ধরা পড়ল বদি। আব্বা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না বদির মত তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী ছেলে কেন সব জেনেশুনে এ ধরণের আত্মঘাতী পদক্ষেপ নিল। তাকে গাড়িতে ওঠাবার পর আস্তে আস্তে নিচু গলায় আব্বা ওকে জিজ্ঞেস করলেন,
-বাবা তুমি এটা কি করলে? এর পরিণাম যে হবে ভয়ংকর! স্বভাবসুলভ মৃদু হেসে বদি জবাব দিল,


www.nagorikpathagar.org

-চাচা, আমি ভালোভাবেই জানতাম এই দুর্গ থেকে পালানো কিছুতেই সম্ভব নয়। তবুও এই নাটক কেন করেছিলাম জানেন? ভেবেছিলাম এ ধরণের আচরণ করলে ওরা নিশ্চই গুলি করে আমাকে মেরে ফেলবে। ফলে পাশবিক অকথ্য নির্যাতনের হাত থেকে চির নিস্তার পাব।

কী আশ্চর্য্য চরিত্র! মুক্তিযুদ্ধ কিংবা গেরিলাদের কোন খবরই সে দেবে না। তার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য সে মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে চেয়েছিল! শ্রদ্ধায় আব্বার মাথা সেদিন বদির দেশপ্রেমের গভীরতা দেখে নিচু হয়ে এসেছিল। মনে মনে ভেবেছিলেন যে দেশমাতৃকা বদির মত মুক্তিপাগল সন্তানের জন্ম দিয়েছে; সে দেশের আজাদী বিজাতীয় কোন শক্তির পক্ষেই কুক্ষিগত করে রাখা সম্ভব হবে না। বদির মত দামাল ছেলেদের আত্মাহুতি কিছুতেই ব্যর্থ হতে পারে না। সেদিন আব্বাদের সাথে বদি ফিরে আসেনি ইন্টেরোগেশনের পর সেফ হাউজে। ফেরেনি বদি স্বাধীনতার পরেও। এ ধরণের হাজারো বদির রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা কতটুকু সার্থক হয়েছে? স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে কতজন? এর যথার্থ হিসাব-নিকাশের মাধ্যমেই তাদের আত্মত্যাগের মর্যাদা দিতে হবে বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে।


www.nagorikpathagar.org

# কমরেডশীপ

# ৪৪



www.nagorikpathagar.org

# ৯

আসামের জকিগঞ্জ থেকে প্রায় ধর্মতলা পর্যন্ত বিস্তৃত চার নম্বর সেক্টর। ভারত-পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত জুড়ে পাথারিয়া হিলস এর কোল ঘেষে দুই দিকেই শুধু চা বাগান। চড়াই উৎরাই পেড়িয়ে শুধু ঘন বন আর সবুজের সমারোহ। জুন মাসের শেষাশেষি সিদ্ধান্ত গৃহিত হল বাংলাদেশের চা বাগানগুলোর উৎপাদন বন্ধ করে দেবার জন্য ফ্যাক্টরিগুলো ধ্বংস করে দেয়া হবে।

কলকলিঘাট BSF camp ছাড়িয়ে পাথারিয়া হিলসের গভীর জঙ্গলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ক্যাম্প। সে ক্যাম্প থেকে দিলকুশা গার্ডেনের মেশিনঘর উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। আমি এই গেরিলা অপারেশনের প্ল্যানিং পর্যবেক্ষণ করার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলাম। ঠিক হলো সেকশন স্ট্রেন্থের চারটি গ্রুপ নিয়ে একটি শক্তিশালী দল পাঠানো হবে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করার জন্য। সর্বমোট ৪৫জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল। একটি প্রটেকশন পার্টি, দুটো মেইন Assault গ্রুপ এবং একটি এক্সপ্লোসিভ গ্রুপ। বাবু, আতিক, ফারুক এবং মাহবুবকে নিযুক্ত করা হলো গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে। ঠিক করলাম আমিও যাব তাদের সাথে। সীমান্ত থেকে প্রায় মাইল পাচেঁক ভিতরে অবস্থিত টার্গেট। রাত ১০টায় RV থেকে রওয়ানা হয়ে ভোর তিনটায় টার্গেট-এ রেইড করা হবে। এক ঘন্টার মধ্যে মেশিনঘর উড়িয়ে দিয়ে ৪টার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। দিলকুশা, বরলেখা ও জুড়িতে পাকিস্তান আর্মির শক্তিশালী ঘাটি রয়েছে। আচমকা হামলা চালিয়ে অপারেশন শেষ করে অতি দ্রুততার সাথে withdraw করে ফিরতে না পারলে encircled হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ভিষণ বিপদজনক মিশন।

রাত ঠিক ১০টায় গাইড নিয়ে পাহাড়ী জঙ্গলের পায়ে চলার চোরা পথে রওয়ানা হলাম। সাধারণ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সবগুলো পথই মাইনড; বিপদসংকুল। অতি সন্তর্পণে নাইটমার্চ শুরু হল। কোন বিভ্রাট ছাড়াই নিঝুম রাতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা গান শুনতে শুনতে জোনাকির আলোয় নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি আমরা। ঘনঘোর অন্ধকার। গভীর জঙ্গলে মাঝেমধ্যে নিশাচর জন্তুর চলাফেরার আওয়াজ কখনো কখনো শুনতে পাচ্ছিলাম। কোথাও পাহাড়ী ঝরণার কুলকুল ধ্বনি। এই পাহাড়ী এলাকায়



www.nagorikpathagar.org

বিচক্ষণ গাইড ছাড়া এক পা নড়ারও জো নেই। আমাদের গাইড হিসেবে থাকতো অভিজ্ঞ চোরাকারবারীরা। সমস্ত চোরা পাহাড়ী পথঘাট তাদের নখদর্পণে। শামছু মিঞা তেমনই একজন চোরাচালানকারি। সংগ্রামে যোগ দিয়েছে দেশকে খানসেনাদের হাত থেকে আজাদ করার জন্য। তার বদৌলতে আমরা বেশ ক'জন অভিজ্ঞ গাইড পেয়েছিলাম। আজ শামছু মিঞা চলেছে আমার সাথে। হক ভাই স্বয়ং যাবেন তাই পথ দেখাবার দায়িত্ব সে অন্য কাউকে দিতে নারাজ। সে যাবে স্বয়ং নিজে।

শামছু মিঞা কখনোই আমাকে একা ছাড়েনি। ওর উপস্থিত বুদ্ধি ও এলাকা সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানের জন্য আমরা অনেক সফল অভিযান করতে পেরেছি। নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকেও বেচেঁ গিয়েছি শামছু মিঞার অভিজ্ঞতার জন্য কয়েকবার। আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো এবং ভালবাসতো শামছু মিঞা। প্রতিটি অপারেশনে যেখানেই আমি গিয়েছি শামছু মিঞা আমাকে বুক দিয়ে ছায়ার মত ঘিরে থেকেছে। তার কথা হল যদি কিছু হয় সেটা তার হউক। আমার কিছু হলে সেটা সে সহ্য করতে পারবে না। পারবে না সে নিজেকে ক্ষমা করতে। আমার প্রতি তার এই অদ্ভুত মমতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা ভোলা যাবে না কোনদিন। সময়মত টার্গেটের কাছে RV-তে পৌছে গেলাম আমরা। কারখানাটা পাক আর্মির একটি প্লাটুন পাহারা দিচ্ছে। কভারিং গ্রুপের ছত্রছায়ায় Assault গ্রুপ দু'টোর বিচ্ছুরা নিঃশব্দে এগিয়ে গেল টার্গেট কব্জা করতে। গেটে দু'জন প্রহরী। তাদের নিরস্ত্র করে চার্জ করা হল টার্গেট। কয়েক মিনিট গোলাগুলির পর পুরো প্লাটুন আত্মসমর্পণ করল আমাদের Assault গ্রুপের কাছে। তাদের নিরস্ত্র করে বন্দি করা হল। ডেমোলিশন গ্রুপ ক্ষীপ্র গতিতে শুরু করল চার্জ ও এক্সপ্লোসিভ বসাবার কাজ। কয়েক মিনিট পর চার্জ ডেটোনেট করা হল। কান ফাটানো আওয়াজের সাথে সাথে পুরো মেশিনঘর একটা ধুঁয়া ও আগুনের কুন্ডলী হয়ে উঠে গেল আকাশে। ক্ষণিকের জন্য সমস্ত বাগানটাই আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তারপরই নেমে এল অন্ধকার।

বাগান রেইড করা হয়েছে বুঝতে পারল দিলকুশা, বরলেখা ও জুড়িতে অবস্থিত খানসেনারা। সবদিক থেকেই শুরু হল গোলাবর্ষণ। মর্টার আর ভারী মেশিনগানের অজস্র গোলা এসে দিলকুশা গার্ডেনের চা গাছের ঝোপগুলো সমূলে উপড়ে ফেলছিল। উপত্যাকার ধান ক্ষেতেও এসে পড়ছিল গোলাগুলো। হঠাৎ করে ক্রস ফায়ারে পড়ে


www.nagorikpathagar.org

আমরা বেশ বেকায়দায় পড়েছি। **withdraw** করার রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল শত্রুপক্ষের অবিরাম গোলাবর্ষণে। আমরা একটা টিলার গা ঘেষে কোনরকমে কভার নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলাম। সঙ্গে রয়েছে প্রায় ৮/১০ জন বন্দি।

হঠাৎ করে আমাদের প্রটেকশন পার্টির একটা ছেলে বাবুলের ডান পায়ে মেশিনগানের গুলি লেগে হাটুর নিচ থেকে ডান পা'টা প্রায় দু'টুকরা হয়ে গেল। অত্যন্ত সাহসী আর নির্ভীক এই বাবুল। যেকোন বিপদে আদেশ পাওয়া মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি। পায়ে গুলি লাগায় সে নিজেকে ভিষণ অসহায় মনে করছিল। আমরা তাকে ধরাধরি করে কিছুটা নিরাপদ জায়গায় শুইয়ে দিয়ে আমি বললাম, "তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এ জায়গা থেকে অবিলম্বে আমাদের গোলাগুলির বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে। তা না হলে সবাইকে মরতে হবে নতুবা বন্দি হতে হবে খানসেনাদের হাতে। সময়ও বয়ে চলেছে অতি দ্রুত। সকাল হওয়ার আগেই পাথারিয়া হিলস এর জঙ্গলে গিয়ে পৌছাতে হবে আমাদের। কিন্তু বাবুলকে নিয়ে কি করা যায়? তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া দুরুহ কাজ। কিন্তু বাবুলকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখেই বা যাই কি করে! বিবেক কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। ঠিক করলাম যেভাবেই হোক বাবুলকে বহন করে সাথে নিয়ে যাব। একটা গামছা দিয়ে ভাঙ্গা পা'টা দু'টো কাঠি দিয়ে কোনমতে বাধঁলাম। চারটা রাইফেল ও শ্লিং দিয়ে একটা স্ট্রেচার বানানো হল। এক বাবুলের জন্য সবার জীবন বিপন্ন করা ঠিক হবে না। তাই ঠিক করলাম মাত্র ৮জনকে রেখে বাকি সবাইকে চলে যেতে বলব। কারণ বাবুলকে কাধেঁ নিয়ে অতি সতর্কতার সাথে আস্তে আস্তে চলতে হবে আমাদের। সবাইকে জড়ো করে বললাম, "বাবুলকে কাধেঁ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ৮জন ভলান্টিয়ার চাই।" সবাই বুঝতে পারল এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে বিশেষ ঝুঁকি নিতে হবে। তাই সবাই কিছুটা ইতঃস্তত করছিল স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে। কিন্তু বাবুলকে সঙ্গে নিয়ে যাবই। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বললাম, "তোমাদের মধ্যে ভলান্টিয়ার না পাওয়া গেলে আমি একাই বাবুলকে কাধেঁ বয়ে নিয়ে যাব।" আমার কথায় কি প্রতিক্রিয়া হল জানি না; দেখলাম সবাই ভলান্টিয়ার হতে চায়। তাদের মধ্য থেকে ৮জনকে রেখে বাকিদের চলে যাবার আদেশ দিলাম। বললাম, "বেঁচে থাকলে পাথারিয়ার জঙ্গলের RV-তে আমরা



www.nagorikpathagar.org

বাবুলকে নিয়ে পৌছাব। চার ঘন্টার মধ্যে আমরা যদি না পৌছাতে পারি তবে তোমরা সবাই বেইস ক্যাম্পে চলে যাবে।" স্বাভাবিক অবস্থায় RV-তে পৌছাতে ঘন্টা দু'য়েক লাগার কথা। বাবু, আতিক, মাহবুব, ফারুক ওরা কিছুতেই আমাদের রেখে যেতে চাচ্ছিল না। তারা বুঝতে পেরেছিল আমি নিজে না থাকলে দলের অন্যরা বাবুলকে বহন করে নেবার ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব নিতে ইতঃস্তত করত; তাই আমি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমার নির্দেশে ওরা চলে গেল বাধ্য হয়ে নিজেদের অনিহাসত্ত্বেও। রয়ে গেলাম আমি, শামছু মিঞা, বাবুল আর ৮জন মুক্তিযোদ্ধা।

বাবুলকে কাধেঁ তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে চলা শুরু করলাম আমরা। দুর্গম পাহাড়ী রাস্তার চড়াই উৎরাই পেরিয়ে কাউকে কাধেঁ বহন করে নিয়ে যাওয়া সত্যি ভিষণ কষ্টকর। কিন্তু একজন সহযোদ্ধার জীবন বাচাঁতে সব কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে অতি সতর্কতার সাথে বন্ধুর ও বিপদজনক পথ পাড়ি দিয়ে আমরা চার ঘন্টার আগেই পৌছাতে পেরেছিলাম পাথারিয়া হিলস এর জঙ্গলের RV-তে। আমাদের ফিরে পেয়ে বাকি অপেক্ষারত সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাদের জড়িয়ে ধরল। সেখানে পাহাড়ী এক হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে বাবুলের ফার্ষ্ট এইড এর ব্যবস্থার পর স্ট্রেচারে করে তাকে বয়ে নিয়ে বন্দিদের সাথে করে ফিরে এসেছিলাম বেইস ক্যাম্পে।

সমূহ বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বাবুলকে কাধেঁ করে বয়ে আনার সিদ্ধান্ত একটা শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে। আমার অধীনস্ত ক্যাম্পগুলোর মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে সেই দৃষ্টান্ত এক অভূতপূর্ব প্রভাব ফেলেছিল। একের উপর অপরের নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল অনেক। এরপর মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমার অধীনস্ত কোন মুক্তিযোদ্ধাকে কখনোই আহত অবস্থায় শত্রুর কবলে অসহায় অবস্থায় ফেলে আসা হয়নি। এমনকি মৃত মুক্তিযোদ্ধাদের লাশও উদ্ধার করে নিয়ে আসার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়েছে সর্বক্ষেত্রে।


www.nagorikpathagar.org

# বয়রায় এক রাত

# ১১



www.nagorikpathagar.org

# ৭

মে মাসের শেষের দিকে আমি তখন ৮নং সেক্টর এবং ৯নং সেক্টরে গেরিলা এ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছি। রিক্রুটমেন্টের জন্য কৃষ্ণনগর থেকে টাকি পর্যন্ত সমস্ত ইয়ুথ ক্যাম্প ও শরনার্থী ক্যাম্পগুলো থেকে মুক্তিযোদ্ধা বাছাই করার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছি ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে।

একদিন কৃষ্ণনগর থেকে কাজ সেরে বনগাঁ ফিরে আসছিলাম। বয়রা পৌঁছতেই সন্ধ্যা হয়ে এল। ভাবলাম, রাতটা হুদাভাই মানে ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদার সাথেই কাটাব। বয়রা ক্যাম্পে পৌঁছলাম সন্ধ্যার পর। হঠাৎ করে বিনা নোটিশে আমাকে দেখে হুদাভাই বেশ আশ্চর্য্য হলেন,

-কি ব্যাপার! হঠাৎ করে তুমি এখানে?

- কৃষ্ণনগর থেকে ফিরছিলাম; ভাবলাম আপনার সাথে দেখা করে যাই।

-ভালোই হলো, তুমি এসেছ। আজ রাতে একটা ভিষণ ইন্টারেষ্টিং অপারেশনে পাঠাচ্ছি একটা ফাইটিং পেট্রল - মাছলিয়ায়। খবর পেয়েছি খানসেনাদের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আজ রাতে মাছলিয়ায় অবস্থান করবে। ব্যাটাকে জ্যান্ত ধরে আনব ভাবছি। বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম হুদাভাই এর সিদ্ধান্ত শুনে। বললাম,

-হুদাভাই আপনার আপত্তি না থাকলে আমিই লিড করবো এই অপারেশন। হুদাভাই বললেন,

-বেশ তো, যাও ওদের সাথে। ওরা তোমাকে পেলে ভিষণ খুশি হবে। They will be in high moral.

রাতের খাওয়া শেষে ফাইনাল প্ল্যানটা দেখালেন ক্যাপ্টেন হুদা। বর্ডার থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত মাছলিয়া হাই স্কুল। সেখানেই রাত কাটাবেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার। Troops-দের advanced position পরিদর্শনে এসেছেন কমান্ডার। মোক্ষম সুযোগ। এটা হাতছাড়া করা যায় না; তাই এ সিদ্ধান্ত। ৫০জন বাছাই করা মুক্তিযোদ্ধাদের একটা দল গঠন করে গাইডকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আকাশে সেদিন খন্ড খন্ড মেঘ। একফালি চাঁদ। বিস্তৃত ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে তালগাছ আর কাটা বাবলার ঝোপ। এর মাঝ দিয়েই গাইড আমাদের নিয়ে চলেছে।



www.nagorikpathagar.org

সিঙ্গেল ফাইল ফর্মেশনে এগিয়ে চলছি আমরা। আমার আগে গাইড আর সবাই আমার পিছে। ধানক্ষেতের আল ভেঙ্গে চলেছি আমরা। রাত তিনটায় টার্গেটে পৌছানোর কথা। পথে গ্রামগুলোর পাশ কাটিয়ে চলেছিলাম আমরা। মাছলিয়ায় পৌছানোর আগে পথে কোন বাঁধা নেই। শত্রুপক্ষের কোন অবস্থানও নেই গোয়েন্দাদের খবর অনুযায়ী। তাই আমরা বেশ রিলাক্সড মুডেই হেটে চলেছিলাম নিঝুম প্রকৃতির নিঃস্তব্দতা ও মৃদু হাওয়ার পরশ উপভোগ করতে করতে। প্রতি এক ঘন্টা হাটার পর পনের মিনিট বিশ্রাম। আবার চলা। এভাবে প্রায় মাইল চারেক পেরিয়ে এসেছি। সারাটা পথই পেরিয়ে এসেছি র্নিবিঘ্নে। কোন অসুবিধাই হয়নি। গভীর রাত। চারিদিকে এক অদ্ভুত নিরবতা। যতদূর চোখ যায় কেবলই বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। মাঝে মধ্যে সেই একই বাবলার ঝোপ অথবা একগুচ্ছ তালগাছ দাড়িয়ে। মৃদুমন্দ বাতাসে তালগাছের পাতায় সরসর শব্দ আর রাতের নিঃস্তব্দতায় শোনা যাচ্ছে একটানা ঝিঁ ঝিঁ-র ডাক। মাঝে মধ্যে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দু'একটা পাখি। মাঠের মধ্যে কয়েকগুচ্ছ ঘর-বসতি নিয়ে ছোট ছোট গ্রাম বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। ম্লান চাঁদের আলোয় চারিদিকে আলো আধারের লুকোচুরি। রাতের কুহেলিকা ভেদ করে আমরা নিশির ডাকে যেন হেটে চলেছি মোহগ্রস্তের মত।

বাবলার একটা ঝোপ পেরুতেই হঠাৎ আমার সন্ধানী দৃষ্টি ২৫/৩০গজ দূরে গিয়ে আটকে গেল কয়েকটি কালো ছায়াতে। মানুষের অবয়ব বলে মনে হচ্ছে! একইসাথে শুনতে পেলাম কোদাল, বেলচে দিয়ে মাটি খোড়ার শব্দ। থমকে দাড়ালাম। সামনের গাইডকে স্পর্শ করে থামিয়ে দিলাম। সাংকেতিক ইশারায় দলের অন্য সবাইও দাড়িয়ে পড়ল মুহুর্তে। ঠিকই বুঝেছি। মানুষের অবয়বই বটে। খানসেনাদের একটি দল ডিফেন্স তৈরি করছে। স্ট্রেন্চ খোদার শব্দই ভেসে আসছে অল্পদূরের ব্যাবধান থেকে।

আমরা থমকে দাড়াতেই অস্ত্র কর্ক করার শব্দ হল। ওরাও হয়তো আমাদের দেখে থাকবে। মুহুর্তে দাড়িয়েই হিপ পজিশন থেকে আমি আমার ষ্টেনগানের ট্রিগার টিপলাম। কট করে একটা আওয়াজ হল কিন্তু আমার ষ্টেনগানে ফায়ার হল না। Faulty Magagine. ম্যাগজিনে গুলি ঠিকমত ভরা হয়নি সেকারণেই ফায়ার হল না। ষ্টেনের ম্যাগজিন বদলি করছিলাম তরিৎ গতিতে হঠাৎ এলএমজি-র একটা বার্ষ্ট ফায়ার হল বিপক্ষের তরফ থেকে। একঝলক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। একটি বুলেট এসে আমার ডান কব্জিতে


www.nagorikpathagar.org

বাধাঁ ষ্টিলব্যান্ডের ভারী Omega ঘড়িটাতে লেগে মাঝ আঙ্গুলটা ভেঙ্গে বেরিয়ে গেল। ঘড়িটার বেল্ট ছিড়ে যাওয়ায় ছিটকে পড়ে গেল কোথাও। ততক্ষণে আমার ঠিক পেছনে হাওয়ালদার হাই পাল্টা গুলি ছুড়ে ধরাশায়ী করে দিয়েছে খানসেনাদের দু'জনকেই। সবাই আমরা তখন ধানক্ষেতের আলের কভার নিয়ে গুলি ছুড়ে চলছি। ওদের তরফ থেকেও গুলি বৃষ্টি ছুটে আসছে আমাদের দিকে। গোলাগুলির মধ্যেই হাইকে নির্দেশ দিলাম চারজনকে সঙ্গে নিয়ে ফ্ল্যাং দিয়ে ক্রল করে এগিয়ে গিয়ে গ্রেনেড চার্জ করতে।

আমাদের ফায়ারিং কভারে ওরা ওদের দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য ক্রলিং করে এগিয়ে গেল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পরপর অনেকগুলো গ্রেনেডের বিষ্ফোরণ ঘটল। সাথে সাথে আমরা সবাই লাইং পজিশন থেকে উঠে চার্জ করলাম শত্রুপক্ষের উপর। হাতাহাতি লড়াই; দু'পক্ষ থেকেই ফায়ারিং বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে দু'একটা বিক্ষিপ্ত ফায়ারিং এর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমাদের অতর্কিত হামলায় সেখানেই প্রায় ১৫ জন খানসেনা নিহত হয়েছিল। দু'জনকে জ্যান্ত বন্দি করা হয়েছিল। আমি ছাড়া আমাদের আর কারোরই কোন ক্ষতি হয়নি। অবস্থা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার পর বুঝতে পেরেছিলাম খানসেনাদের একটি প্লাটুন রাতের অন্ধকারে মেইন পজিশন থেকে এগিয়ে এসে নতুন ডিফেন্স তৈরি করছিল এ্যাডভান্স পজিশন হিসেবে। এ মুভমেন্ট সম্পর্কে আমাদের কোন খবরই ছিল না।

এই অপ্রত্যাশিত আচমকা সংঘর্ষের ফলে মাছলিয়া অপারেশন বাদ দিয়ে বাধ্য হয়েই আমাদের ফিরে আসতে হয়। গ্রামবাসীদের সাহায্যে একটি গরু গাড়িতে মৃত খানসেনাদের লাশ ও বন্দিদের সাথে নিয়ে ফিরে এসেছিলাম আমরা। ব্যাটালিয়ন কমান্ডারকে জ্যান্ত ধরে আনতে না পারলেও সেদিনের অপারেশনের সাফল্যে আমরা সবাই সন্তুষ্ট হয়েই ফিরছিলাম বিজয়ী হয়ে। এ যাত্রায় অলৌকিকভাবেই রক্ষা পেয়েছিলাম যমরাজের হাত থেকে। মাত্র ২৫/৩০ গজের স্বল্প ব্যাবধান থেকে ফায়ার করা শত্রু পক্ষের ৭.৬২ চাইনিজ এলএমজি-র বুলেটটি যদি হাতঘড়ির ষ্টিলব্যান্ড-এ না লেগে একটু এদিক ওদিক হতো তবে সে বুলেট আমার ফুসফুস ভেদ করে বেরিয়ে যেত। নিতান্ত আপনজনের মত আমার প্রিয় ওমেগা ঘড়িটি তার জীবন দিয়ে যেন আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়ে গেল সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌তা'য়ালার নির্দেশে।



www.nagorikpathagar.org

# আজাদ ফিরে আসবে



www.nagorikpathagar.org

# ৭

২৯শে আগষ্ট ১৯৭১। বর্ষণমুখরিত রাত। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজাদদের বাসায় সে রাতে অবস্থান করছে আজাদ, কাজি কামালউদ্দিন এবং জুয়েল। আজাদদের দু'তিন জন আত্মীয় এসেছে গ্রামের বাড়ি থেকে। তারাও সে রাতে সেই বাড়িতেই থাকবে।

আজাদের মা অনেকদিন পর ওদের পেয়ে ভালো খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন। ওরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। ধুমকেতুর মত এসে উপস্থিত হয় মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ করেই চলে যায়। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গোপনে লুকিয়ে থেকে ঢাকার বুকে দুর্ধর্ষ অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে ওরা জীবন বাজি রেখে। খাওয়া থেকে আরম্ভ করে কত রকমের কষ্টই না সহ্য করতে হচ্ছে ওদের। হাজার হলেও মায়ের প্রাণ। তাই অনেকদির পর ছেলেদের কাছে পেয়ে তাদের কিছু ভালোমন্দ খাওয়ানোর আয়োজন করেছেন তিনি। খাওয়া সেরে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন গল্প শুনতে শুনতে অনেক রাত করে সবাই শুতে গেল।

ড্রইং রুমে ঢালা বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছে আজাদ, কাজি, জুয়েল ও গ্রাম থেকে আসা আজাদের আত্মীয়রা। হঠাৎ করে দরজা ভেঙ্গে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল বেশ কয়েকজন অস্ত্রধারী খানসেনা। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই অপ্রস্তুত। ঘরে ঢুকেই লাথি মেরে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা হল সবাইকে। জুয়েল কয়েকদিন আগে যাত্রাবাড়ি অপারেশনে আহত হয়েছে। ডঃ আজিজের ক্লিনিকে গোপনে তার হাতের অপারেশন করা হয়েছে। হাতে তখনও ব্যান্ডেজ বাধাঁ। অল্পক্ষণেই সবাই বুঝতে পারলো বাড়ি রেইড করা হয়েছে। সাক্ষাত জমদূতের আগমন, মৃত্যু অবধারিত।

খানসেনারা ওদের সবাইকে সঙ্গিনের গুতো দিয়ে দেয়ালের কাছে সারিবদ্ধভাবে দাড় করাল। "কাজি কউন হ্যায়?" প্রশ্ন করল একজন। কেউ মুখ খুলল না। অন্য দু'জন সারা ঘর তল্লাশী করছে। হঠাৎ একজন একটা চাইনিজ ৭.৬২ পিস্তল একটা বালিশের নিচ থেকে উদ্ধার করল। প্রমাদ গুনল সবাই। পিস্তলটা কাজির। আবার প্রশ্ন, "কাজি কউন হ্যায়?" কেউ কোন জবাব দিচ্ছে না দেখে একজন সুবেদার এগিয়ে এসে জুয়েলের ব্যান্ডেজ বাধাঁ হাতটা অমানুষিকভাবে মুচড়ে ধরল। অসহ্য ব্যাথায় চিৎকার করে জুয়েল



www.nagorikpathagar.org

বেহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গোঙ্গাতে থাকল। জুয়েলের আর্তনাদে আজাদের মা পাগলীনির মত ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। একজন খানসেনা রাইফেলের বাঁট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত হানল। তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে দরজার মুখেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। বেদম মারধর শুরু হল সবার উপর। কিল-ঘুষি, বাঁটের গুতো, লাথি কিছুই বাদ পড়ছে না। সব অত্যাচার সহ্য করে সবাই নিশ্চুপ দাড়িয়ে আছে।

কাজি ভাবছে কি করা যায় ? তাকে যেখানে দাড় করানো হয়েছে তার বিপরীতেই খোলা দরজা, পাশে একটা ছোট্ট ডিভান। হঠাৎ একজন তরুণ ক্যাপ্টেন ঢুকল খোলা দরজা দিয়ে পিস্তল হাতে। তাকে দেখেই সুবেদার সাহেব খুঁজে পাওয়া চাইনিজ পিস্তলটা তার হাতে তুলে দিয়ে কি যেন বলছিল। সেই ক্ষণিকের অসতর্ক মুহূর্তে কাজি একলাফে ছিনিয়ে নিল সুবেদারের হাতের চাইনিজ ষ্টেনগান। সেটা নিয়েই কাজি উঠে দাড়াল ডিভানের উপর। কেউ ভাবতে পারেনি এ ধরণের একটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নেবে কাজি।

-Don't move. Hands up. গর্জে উঠল কাজি। তার ষ্টেনগান তখন ক্যাপ্টেন ও সুবেদারের দিকে তাক করা। অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিহ্বল হয়ে সুবেদার ও ক্যাপ্টেন দু'জনেই হাত তুলে দাড়াল নিরুপায় হয়ে। কাজি আবার গর্জে উঠল,

-Tell your man to drop their guns. Quick.

ক্যাপ্টেন আদেশ দিল অন্যদের। সবাই হাতিয়ার ফেলে হাত উচুঁ করে দাড়িয়ে রইল হতবম্ব হয়ে। হঠাৎ কাজি দেখতে পেল আরেকজন খানসেনা খোলা দরজা দিয়ে ঢোকার জন্য এগিয়ে আসছে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল কাজি ফায়ার ওপেন করার। তার ষ্টেনগান গর্জে উঠল। ঘরের সব কয়জন খানসেনা এবং দরজার দিকে এগিয়ে আসা খানসেনাটি লুটিয়ে পড়ল গুলি খেয়ে। কাজি চিৎকার করে মুক্তিযোদ্ধাদের বলল,

-Run, Run for life. পালাও। বলেই সে নিজেও খোলা দরজা দিয়ে ফায়ার করতে করতে বেরিয়ে গেল বাইরের অন্ধকারে।

কয়েক মুহূর্তের ঘটনা। বাইরে পাহারারত খানসেনাদের কিছু বোঝার আগেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কাজি। তার পরনের লুঙ্গি কখন খুলে পড়ে গেছে টেরও পায়নি কাজি। প্রাণপণে পাচিঁলের পর পাচিঁল টপকে ছুটে চলেছে কাজি সম্পূর্ণ দিগম্বর আবস্থায়।



www.nagorikpathagar.org

অনেকদূর চলে এসেছে কাজি। তখনও শোনা যাচ্ছে গোলাগুলির অবিশ্রান্ত আওয়াজ। আজাদদের বাসার সীমানা থেকে কাজি তখন অনেকদূরে চলে এসেছে।

হঠাৎ তার খেয়াল হল সে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ। এ অবস্থায় কি করা যায়? উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় চলাও বিপদজনক। হঠাৎ ওর মনে হল দিলু রোডে মুক্তিযোদ্ধা আলমদের বাড়ি। সেখান থেকেই কাপড় সংগ্রহ করে পালাতে হবে। ছুটে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই জানালা দিয়ে মুখ বের করল আলমের ছোট বোন। কাজিকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ও ভরকে গেল। সংক্ষেপে কাজি সব ঘটনা খুলে বলে তাকে অনুরোধ করল কিছু কাপড়ের বন্দোবস্ত করার জন্য। তড়িৎ গতিতে আলমের বোন আলমেরই এক প্রস্থ কাপড় এনে দিল কাজিকে। কাজি সেগুলো পরে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। আলম তখন গেছে মেলাঘরে, অস্ত্রের অন্বেষায়। তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধি এবং অসীম সাহসের বদৌলতে কাজি প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল সে রাতে। দলের অন্য কেউই আজাদদের বাড়ি থেকে সে রাতে পালাতে পারেনি। সবাই ধরা পড়েছিল খানসেনাদের হাতে। পরে তাদের বন্দি অবস্থায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্যান্টনমেন্টে। দেশ স্বাধীন হবার পর ওদের কারো কোন হদিস পাওয়া যায়নি।
আজাদের মা আজো আজাদের অপেক্ষায় রয়েছেন। তার ধারণা তার ছেলে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে এবং ফিরে আসবে একদিন।


www.nagorikpathagar.org

# মাইক তোমাকে ভুলবনা

# ৫৫



www.nagorikpathagar.org

# ৫

জুড়ি উপত্যাকার ধামাই টি ষ্টেটের গা ঘেষে লাঠিটিলা বিওপি। তারপর পাথারিয়া হিলসের ঘন সবুজ বন। ঠিক তার বিপরীতে মাইল ৩/৪ দূরত্বে কুকিতল। মুক্তি বাহিনীর একটি ক্যাম্প। পরন্ত দুপুরের রোদের আমেজ উপভোগ করছিলাম তাবুর বাইরে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে। চারিদিকে ছোট-বড় টিলার আবর্তে ঘেরা কুকিতল ক্যাম্প। প্রায় সাড়ে চারশত মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে এ ক্যাম্পে। ক্যাম্পের প্রায় মাঝখানের টিলাটাতেই আমার তাবু। যখনই এখানে আসি এ তাবুটাতেই থাকি আমি। অন্যসময় খালি থাকে আমার এ তাবুটা। সেদিন সারা ক্যাম্প জুড়ে নিঃশব্দ ব্যস্ততা। রাতে শেওলার কাছাকাছি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু ধ্বংস করার অপারেশন করা হবে। প্ল্যান চুড়ান্ত করা হয়ে গেছে। এখন সবাই যার যার দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে নিতে ব্যস্ত। গ্রুপ কমান্ডাররা সমস্ত প্রস্তুতির তদারকি করছে। আমি বসে বসে সব দেখছিলাম, হাতে ছিল গেরিলা যুদ্ধের উপর জেনারেল গিয়াপ এর একটা বই। ছেলেদের প্রস্তুতির তৎপরতা দেখতে দেখতে একসময় বইটিতে ডুবে গিয়েছিলাম।

-হক ভাই, আপনার চা। বই থেকে মুখ তুলে চেয়ে দেখি মাইক ধূমায়িত এক কাপ চা আমার সামনে ছোট্ট একটি টেবিলে রেখে দাড়িয়ে। ১৪/১৫ বৎসরের এই বালক এ ক্যাম্পে আমি এলে আমার তদারকির কাজ করে। আমার থাকা-খাওয়া সব দায়িত্বই পড়ে তার উপর। এমনকি আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে ওই কর্তা হয়ে উঠে। ছেলেটি কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক গৃহস্ত পরিবারের ছেলে। দেখতে বেশ ফুটফুটে। ঘন একরাশ লম্বা চুল তাকে আরো সুন্দর করে তুলেছে। তখনকার দিনে ঘাড় অব্দি লম্বা চুলের ফ্যাশন। বয়স অল্প হলেও বেশ উপস্থিত বুদ্ধি ছিল ছেলেটার। চটপটে তড়িৎকর্মা ছেলেটাকে সবাই ভালবাসতো। আমারও বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিল ছেলেটি।

সংগ্রামের প্রথমার্ধেই খানসেনারা তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। তাদের হানায় ওর পরিবারের সবাই প্রাণ হারায়। ওই একমাত্র বেচেঁ যায় হায়েনাদের কবল থেকে। খানসেনাদের হাত থেকে প্রাণে বেচেঁ গিয়ে এসে যোগ দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। প্রাথমিক ট্রেনিং এর পর থেকেই রয়েছে কুকিতল ক্যাম্পে। প্রাণোচ্ছল হাসিখুশি চঞ্চলতার মুর্তপ্রতীক মাইক। বয়সে ছোট; তাছাড়া আমার দেখাশুনা করে তাই কোন অপারেশনে



www.nagorikpathagar.org

যাবার সুযোগ হয়নি তার। এ নিয়ে ও ক্যাম্পের বিভিন্ন কমান্ডারদের কাছে অনেকবার আবদার তুলেছে। কিন্তু সবাই তাকে বুঝিয়ে বলেছে,

-তুই হক ভাইয়ের সাথে থাকিস। সেটা কি কম বড় কথা। হক ভাই তোকে বিশেষভাবে স্নেহ করেন সেক্ষেত্রে তোর অপারেশনে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। হক ভাইয়ের খেয়াল রাখাই তোর দায়িত্ব।

এরপর ওর আর কিছুই বলার থাকে না। তাদের আদেশ মান্য করে আমার সাথেই রয়েছে সে।

-ভাই, একটা কথা।

-কি, বল।

-আপনে যদি বাবু ভাইরে কইয়া দেন তবে আমি আইজ অপারেশনে যাইতে পারি।

একরাশ মিনতি ঝরে পড়ছে তার দু'চোখে। কি জানি মনে হল, এতই যখন ওর ইচ্ছে যাক আজ ও অপারেশনে।

-ঠিক আছে, ডাক বাবুকে।

আমার জবাবটা তার জন্য বোধ হয় অপ্রত্যাশিত ছিল। প্রথমটায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল মাইক কিন্তু পরমুহূর্তেই দৌড়ে চলে গেল বাবুকে ডেকে আনতে। অল্পক্ষণ পরেই বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল সে।

-হক ভাই, আমাকে ডেকেছেন?

-হ্যাঁ দেখতো মাইককে তোমাদের সাথে নেয়া যায় কিনা আজ রাতে?

-আপনি যখন হুকুম দিলেন তখন আরতো কিছু বলা যায় না। ঠিক আছে ওকে আমার সেকশনেই include করে নেব।

বুদ্ধিমান মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বাবু বুঝে ফেলেছিল মাইক যে করেই হউক আমাকে রাজি করিয়ে নিয়েছে আজ।

-হ্যাঁ তাই কর।

আমি বাবুকে জবাব দিয়ে আবার বইতে মনোযোগ দিলাম। বাবু মাইককে নিয়ে চলে গেল।

এরপর ডুবে গিয়েছিলাম বইতে। কিছুক্ষণ পর চোখ তুলে তাকাতেই নজরে পড়ল মাইক। ওর অনেকদিনের না বলা ইচ্ছে আজ পূর্ণ হতে যাচ্ছে সেই খুশিতে ওকে



www.nagorikpathagar.org

দেখলাম একটা হরিণ ছানার মত সমস্ত ক্যাম্পে দৌড়ে কি যেন করছে। রাতে খাবার নিয়ে তাবুতে এল ও।

-কি রে? কি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তোকে?

-এক্সপ্লোসিভ বইতে হইবো আমার; বাবু ভাই কইছে। জবাব দিল মাইক। এক্সপ্লোসিভ বহন করার দায়িত্ব পেয়েই ও ভিষণ খুশি। চোখেমুখে সেটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। জিঙ্গেস করলাম,

-কি খুশি তো?

-হ্।

রাতের খাওয়ার পর অপারেশনে যাবার সবাই তৈরি হয়ে Fall in হল। আমি ওদের কমান্ডারদের কাছ থেকে প্রস্তুতির রিপোর্ট নিয়ে শেষ নির্দেশ দিলাম। টার্গেটের কাছে RV-তে পৌছে Assault party আচমকা চার্জ করে পাহারাদারদের কাবু করে সংকেত দেবার পর Explosive party গিয়ে তাদের কাজ করবে। কভারিং পার্টি কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাহারা দেবে operation site এবং বন্দি প্রহরীদেরকে একইসাথে তৈরি থাকবে যেকোন re-enforcement এর মোকাবেলা করার জন্য। বরলেখা থেকে খানসেনাদের re-enforce পাঠাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

যাত্রা হল শুরু। সময়মতই টার্গেটের কাছে RV-তে পৌছে গেলাম। নিঃশব্দে এগিয়ে গেল Assault Gp. আচমকা হামলায় ব্রিজের প্রহরীরা প্রথমে বাধাঁ দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু দুর্ধর্ষ গেরিলাদের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে পাহারারত খান সেনারা অল্পসময়েই আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হল। গোলাগুলির শব্দে বরলেখা থেকে ভারী ১২০ মিমি মর্টারের গোলাবর্ষণ শুরু হল। প্রতিপক্ষের strong position থেকে গোলাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে প্রচন্ড শব্দে ফেটে পড়ছে ব্রিজের চারদিকে। এর মাঝেই জানবাজ গেরিলারা explosive charge লাগিয়ে উড়িয়ে দিল ব্রিজটা। একটা প্রচন্ড শব্দের সাথে সাথে ব্রিজটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল নদী বক্ষে। একরাশ কালো ধূয়াঁ ও অগ্নিকুন্ড দিগন্তে উঠে সমস্ত জায়গাটাকে হঠাৎ করে আলোকিত করে আবার নিমিষেই নিভে গেল। বাতাস ভারি হয়ে উঠল পোরা বারুদের গন্ধে। ব্রিজের কিছু অংশ তখনও জ্বলছে দাউদাউ করে। যার যার দায়িত্ব শেষ করে সবাই পূর্ব নির্ধারিত RV-তে এসে



www.nagorikpathagar.org

একত্রিত হল। Fall in করে কমান্ডাররা যার যার ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট দিচ্ছে। বাবুর সেকশন থেকে রিপোর্ট হল। দু'জন আহত হয়েছে; গোলার স্প্লিন্টারে একজন missing.

-Who is missing? আমার প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব পেলাম না। আবার প্রশ্ন করলাম,

-বাবু, Who is missing?

-মাইক, স্যার।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! রাতের নিঃস্তব্দতা ক্ষণিকের জন্য আমাকে যেন চেপে ধরল। ভেসে উঠল মাইকের প্রাণোচ্ছল হাসিখুশি মুখটা। অনেক অনুনয় অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আজ ওকে অপারেশন এ আনার অনুমতি দিয়েছিলাম। কেমন যেন নিজেকেই ওর মৃত্যুর জন্য দায়ি মনে হচ্ছিল। বুকটা ভারী হয়ে উঠল। নিজের অজান্তেই দু'চোখ ফেটে পানির বন্যা নেমে এল। দূরে তখনও মর্টারের গর্জন শোনা যাচ্ছে। ঐ মর্টারের শেল স্প্লিন্টারেই মৃত্যু হয়েছে মাইকের। ভরা নদী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তাকে। খুজেঁ পাওয়া অসম্ভব তার মৃতদেহ। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না।

-হক ভাই, ভারী গলায় বাবু আমায় সম্বোধন করল।

-Yes. মুখ তুলে চাইলাম ওর দিকে। আমার চোখে পানি দেখে ও আমাকে জড়িয়ে ধরল। ক্রন্দনরত বাবুর শরীরটাও কাঁপছে অনুভব করলাম। নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বলে উঠলাম,

-Take it easy. Prepare to move.

আমার হুকুম পেয়ে সবাই যাত্রা শুরু করল। বাবু আর আমি সবার পেছনে। ফিরে এলাম ক্যাম্পে। শুধু ফিরল না সবার প্রিয় মাইক। ফেরার পর সে রাতটা ব্যথাতুর মন নিয়ে জেগে রইলাম। কখন ভোর হয়ে গেল টের পেলাম না।

-হক ভাই চা! না মাইক নয়, সামনে দাড়িয়ে খোকন। আমার মনের অবস্থা বুঝে কোন কথা না বলে চায়ের পেয়ালা টেবিলে রেখে নিঃশব্দে দাড়িয়ে কাঁদতে লাগল খোকন। ওকে সান্তনা দিয়ে আদেশ দিলাম, ফজরের নামাজের জামাতের বন্দোবস্ত করতে। ও আদেশ পেয়ে বেরিয়ে গেল। ক্যাম্পের সবাই জামাতে ফজরের নামাজ পড়ে মাইকের গায়েবী জানাজা পড়লাম।



www.nagorikpathagar.org

দেশকে স্বাধীন করার জন্য হাজারও শহীদের সাথে মাইকও তার রক্ত স্বেচ্ছায় হাসিমুখে দিয়ে গেল দান। মাইক তার জীবন আহুতি দিয়ে আমাদের উপর দায়িত্ব দিয়ে গেল তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের; সুখী স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করার। এ দায়িত্ব কতটুকু সম্পন্ন করতে পেরেছি এ প্রশ্নের সঠিক জবাব খুজেঁ বেড়াচ্ছি আজো। উত্তর মেলেনি। মাইকের মত লাখো শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করার যে গুরু দায়িত্ব রয়েছে আমাদের উপর সেই দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবো কবে? এ প্রশ্নের জবাব খুজেঁ পেতে হবে আজ বেচেঁ থাকা প্রতিটি মুক্তিসংগ্রামীকে।



www.nagorikpathagar.org

# বীরাঙ্গনা কোহিনূর

# ৭৭



www.nagorikpathagar.org

# ৯

৪ নং সেক্টরের ফুলতলা ক্যাম্প। প্রায় শ'তিনেক মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে সেই ক্যাম্পে। ক্যাম্প পরিদর্শনে এসেছি। দুপুরের খাওয়ার পর্ব শেষ। তাবুতে বিছানায় শুয়ে অলস দুপুরে সময় কাটাচ্ছিলাম।

-May I come in Sir?

-কে? জিজ্ঞাসা করতে তাবুতে ঢুকল ফারুক।

-কি ব্যাপার ফারুক, কিছু বলবে?

-হক ভাই, কয়েকদিন ধরে জহির দু'দিনের জন্য ছুটি চাচ্ছে। সাথে তিনটি গ্রেনেড নিয়ে যেতে চায়।

জহির একজন সেকশন কমান্ডার। সাহসী গেরিলা। ছুটিতে যাবে তাতে আপত্তি নেই কিন্তু সাধারণ নিয়মে কেউ ছুটিতে গেলে তাকে কোন হাতিয়ার দেবার নিয়ম নেই। সব জেনে জহির গ্রেনেড চাচ্ছে কেন? আমার আদেশ ছাড়া জহিরকে গ্রেনেড দিয়ে ছুটিতে পাঠানো সম্ভব নয় বলেই ফারুক কথাটা আমার কাছে তুলেছে। আমিও কিছুটা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলাম জহিরের মত দায়িত্ববান ছেলে সব নিয়ম জেনেও গ্রেনেড নিয়ে যেতে চাচ্ছে কেন? বললাম,

-জহিরকে পাঠিয়ে দাও। অল্পক্ষণ পরেই এসে হাজির হলো জহির।

-কি ব্যাপার জহির? গ্রেনেড নিয়ে ছুটিতে যেতে চাচ্ছ কেন?

-স্যার, ভাবছিলাম ছুটিতে গিয়ে একটা অপারেশন করে ফিরব।

জহির অত্যন্ত দায়িত্ববান ছেলে। অনেক অপারেশনে সে তার যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। তাকে সব ব্যাপারেই বিশ্বাস করা চলে। স্বল্পভাষী জহির। বিয়ানী বাজার শেওলার মাঝখানে তাদের গ্রাম। নিশ্চয়ই কোন টার্গেটের সন্ধান পেয়েছে ও। সাধারণতঃ মুক্তিযোদ্ধাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই তাদের আমরা ছুটিতে যাবার সময় কোন হাতিয়ার সঙ্গে নিতে দেই না।

-টার্গেটটা কি? জিজ্ঞাসা করলাম জহিরকে।

-খানসেনাদের আড্ডা। এর বেশি বিস্তারিত এই মুহূর্তে আপনাকে কিছু বলতে পারব না, স্যার। অপারেশন সফল হলে সবকিছু ফিরে এসে বলব।


www.nagorikpathagar.org

কিছুদিন আগে জহির আর একবার ছুটিতে গিয়েছিল দেশের বাড়িতে। সে সময়ই ও নিশ্চয়ই কোন খবর সংগ্রহ করে ফিরে এসেছে; আমি ভাবলাম।

-ঠিক আছে তুমি যেতে পার গ্রেনেড নিয়ে। তবে খুব সাবধানে থাকবে। আমি দু'দিন পর আবার আসব তোমার অপারেশনের ফলাফল জানতে।

ফারুককে ডেকে জহিরকে গ্রেনেড সরবরাহ করে দু'দিনের জন্য ছুটি মঞ্জুর করে দেবার নির্দেশ দিয়ে চলে এসেছিলাম ফুলতলা থেকে।

ঠিক দু'দিন পর ফুলতলায় আসা হল না কাজের চাপে। এলাম কয়েকদিন পর। ক্যাম্পে এসে পৌছতেই ক্যাম্প ইনচার্জ ফারুক এসে বলল,

-হক ভাই, জহির ভিষণ অসুস্থ। ফিরে আসার পর থেকেই ভিষণ জ্বর। মানসিকভাবেও অপ্রকৃতস্থ।

-কি ব্যাপার, কি হয়েছে, খুলে বলতো? আমার প্রশ্নে ফারুক কেমন যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল জহিরের অপারেশনের কথা।

খানসেনাদের ক্র্যাকডাউনের পরপরই জহির মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। পাক বাহিনী তাদের গ্রামে হানা দিলে স্থানীয় দালালদের কাছ থেকে ওরা জহিরের মুক্তি বাহিনীতে যোগদানের কথা জানতে পারে। তারা প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে জহিরের বাবা ও মাকে নির্মম নিষ্ঠুরতায় হত্যা করে। হত্যা করে তার ছোট ছোট দুই ভাইকে। বাপ-মায়ের সামনেই শিশুদের হত্যা করে জল্লাদেরা। তার একমাত্র বোন কোহিনূরের ইজ্জত হরণ করে। তাদের সবাইকে গুলি করে মেরে যুবতি কোহিনূরকে বাচিঁয়ে রাখে তাদের পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য। এরপর থেকে প্রায় রাতেই এক সুবেদার তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে করে আসে জহিরদের বাড়িতে; আনন্দ-ফূর্তি করার জন্য। অকথ্য নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে হয় কোহিনূরকে প্রায় প্রতি রাতে খানসেনাদের যৌন চাহিদা মেটাতে। গতবার ছুটিতে গিয়ে বোনের কাছ থেকে সবকিছু জানতে পারে জহির। সবকিছু শুনে জহির বোনের কাছে প্রস্তাব রেখেছিল তার সঙ্গে চলে আসার। রাজি হয়নি কোহিনূর। সে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চায়। এ কাজে জহিরের সাহায্য প্রার্থনা করে কোহিনূর। কোহিনূরের পরিকল্পনা কোন একটি নির্দিষ্ট



www.nagorikpathagar.org

রাতে ও সুবেদার সাহেবকে ডেকে পাঠাবে। ওরা এলে তাদের খতম করতে হবে জহিরকে। কি সাংঘাতিক প্রস্তাব! এতে কোহিনূরেরও জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। বোনের আবেদন মেনে নিতে চায়নি জহির। কিন্তু কোহিনূর তার সিদ্ধান্তে অটল। তার এক কথা, জহির তার প্রতিশোধ পরিকল্পনায় সাহায্য না করলে ও আত্মহত্যা করবে কিন্তু জহিরের সাথে বর্ডার পেরিয়ে পালাবে না। তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অনেকটা বাধ্য হয়েই জহির রাজি হয় কোহিনূরের পরিকল্পনায় সাহায্য করতে। বোনকে কথা দিয়ে ফিরে এসেই গ্রেনেড নিয়ে ছুটিতে যাবার প্রস্তাব করে জহির। পরিকল্পনার কথা কাউকেই বলেনি জহির। শুধু বলেছে খানসেনাদের একটি আড্ডা তার টার্গেট। ও জানতো ওদের পরিকল্পনার পক্ষে আমি কিংবা ক্যাম্পের কেউ মত দেবে না। তাই সে বিস্তারিত কিছুই বলেনি কাউকে। গ্রেনেড নিয়ে ফিরে যায় জহির। ওর বোনের সাথে গোপনে সাক্ষাত করার পর সেদিন রাতেই সুবেদার সাহেবকে ডেকে পাঠায় কোহিনূর। ঠিক হয়, খানসেনারা এলে কোহিনূর ঘরের জানালা খুলে দেবে। ওরা পানাহার শেষে আমোদ-ফুর্তিতে যখন ব্যস্ত হয়ে পড়বে তখন আচমকা জহির বাইরে থেকেই ঘরের মধ্যে ছুড়ে মারবে গ্রেনেড। কী সাংঘাতিক আত্মঘাতী পরিকল্পনা! কোহিনূরের প্ল্যান কার্যকরী হলে খানসেনাদের সাথে কোহিনূরেরও জীবন যাবে। জহিরের বিবেক কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না নিজ হাতে বোনের জীবন নিতে। কিন্তু কোন যুক্তিই শুনতে রাজি নয় কোহিনূর। জীবন দিয়ে হলেও তার জিঘাংসা চরিতার্থ করবেই উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়ে। অটল সে তার প্রতিজ্ঞায়। অনেক চেষ্টা করেও জহির কোহিনূরকে এতটুকুও নড়াতে পারেনি তার অটল সিদ্ধান্ত থেকে। কোহিনুরের দৃঢ়তার কাছে আত্মসমর্পণ করে জহির বাধ্য হয়েছে বোনের পরিকল্পনা মেনে নিতে। সন্ধ্যার একটু পরেই সুবেদার সাহেব তার চারজন সঙ্গী নিয়ে এলো জহিরদের বাড়িতে। কোহিনূর ভালো খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত করেছে। সুস্বাদু খাবারের ঘ্রাণ ঘরের পেছনে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা জহিরের মনকে অশান্ত করে তুলল। এক অজানা বেদনায় জহির তখন সম্মোহিত। আকাশ-পাতাল ভাবছে সে বাশেঁর ঝাড়ে গোপনে বসে বসে। হঠাৎ করে ঘরের জানালাটা খুলে দিয়ে একমুহূর্তের জন্য দাড়াল কোহিনূর। জহির জানালা খোলার শব্দে মুখ তুলে দেখল কোহিনূরকে। তার একমাত্র আদরের বোন। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে কোহিনুরের কচি মুখটা। সে চেহারায় কলংকের কোন কালিমা নেই। পবিত্রতার স্নিগ্ধতায় ঐশ্বরিক এক সৌন্দর্যের ছাপ তার মুখায়বে। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে



www.nagorikpathagar.org

জহিরের দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। ক্ষণিকের জন্য জানালায় সে মুখ ভেসে থেকে মিলিয়ে গেল। ঘরের ভেতর তখন চলছে এক নারকীয় উল্লাসপর্ব। একটিমাত্র ছোট বোন। জহিরের কোলে পিঠে করে মানুষ হয়েছে কোহিনুর। কত টুকরো টুকরো অতীত স্মৃতি এসে ভীড় করছে জহিরের বেদনাবিধুর মনে। বেশকিছু সময় কেটে গেল। জহির ডুবে ছিল অতীত স্মৃতিতে। হঠাৎ রাতজাগা একটি পাখির ডাকে অতীত স্মৃতির জগৎ থেকে বর্তমানে ফিরে এল জহির। হাত ঘড়িতে রাত তখন প্রায় দশটা। গ্রামাঞ্চল। মনে হচ্ছে গভীর রাত। আশেপাশের বাড়িগুলোতে নেমে এসেছে রাতের নিঃস্তব্দতা। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। রাতের স্তব্দতা ভেঙ্গে দিচ্ছে খানসেনাদের বেসামাল ফুর্তির হৈহুল্লরে। বাঁশ ঝাড়ের গা ঘেষে ছোট্ট পুকুরটার এক কোনে জ্বলছে একঝাক জোনাকি। নিজেকে সামলে নিল জহির। অপারেশন এখনই শুরু করতে হবে।

পায়ে পায়ে শিকারী বেড়ালের মত ক্রলিং করে জানালার ঠিক নিচে পৌছে গেল জহির। কোমরের গামছার বাধঁন খুলে বের করল দু'টো তাজা গ্রেনেড। খানসেনাদের গলার সাথে ভেসে এল কোহিনূরের চাপাঁ হাসির শব্দ। থমকে গেল জহির; কিন্তু ভেঙ্গে পড়ল না। মনকে শক্ত করে নিয়ে সে খুলে ফেলল গ্রেনেড দু'টোর 'সেফটি পিন'। এক.. দুই.. তিন.. চার ছুড়ে দিল গ্রেনেডগুলো খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে। পরমুহূর্তেই গড়িয়ে কভার নিল পুকুরের খাঁদে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। মাটি কাপাঁনো আওয়াজের সাথে সাথে শোনা গেল মৃত্যুপথযাত্রী লোকদের আর্তনাদ। কোহিনুরের গলাও শুনতে পেল জহির পশুদের আর্তনাদের সাথে। ত্রস্তে উঠে দাড়াল জহির। এগিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে দৃষ্টি দিতেই চোখে পড়ল ক্ষতবিক্ষত পাচঁটা পুরুষ ও একটা নারী দেহের অবশিষ্ট ছড়িয়ে আছে ঘরের মেঝেতে। দূরে কিছু লোকজনের আওয়াজ শোনা গেল। প্রচন্ড বিষ্ফোরণের আওয়াজে জেগে উঠেছে ঘুমন্ত গ্রামবাসী। পালাতে হবে জহিরকে। একমুহূর্তও আর থাকা নিরাপদ নয়। ছুটে পালিয়ে এল মুক্তিযোদ্ধা জহির তার একমাত্র ছোট বোনের শেষ ইচ্ছা পূরণ করে। মোহগ্রস্ত অবস্থায় ক্যাম্পে ফিরে এল জহির। ক্যাম্পে ফিরেই সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে সে। ফারুককে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে অসীম সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা অপ্রকৃতস্থ জহির। সবকিছুই খুলে বলে ফারুককে, "পারলাম না ফারুক বোনকে নিরস্ত্র করতে। তার শেষ ইচ্ছা আমাকে পূরণ করতেই হল।"



www.nagorikpathagar.org

তখন থেকেই ভিষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে জহির। প্রচন্ড জ্বর সাথে এলোমেলো প্রলাপ বকে চলেছে জ্বরের ঘোরে অবিশ্রান্ত।

সবকিছু শুনে স্তব্দ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। কী অদ্ভুত সাংঘাতিক ঘটনা। মাথা নিচু করে ভাবছিলাম আত্মত্যাগী কোহিনূরের কথা - যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে নিয়েছিল দেশের শত্রুদের খতম করার জিঘাংসায়। ভাবছিলাম জহিরের কথা। কী ইস্পাত কঠিন চরিত্রের অধিকারী ছেলে জহির। হায়নাদের নিধণ করতে গিয়ে নিজের একমাত্র ছোট বোনের আহুতি দিতে এতটুকুও কাপেঁনি তার মন। কোহিনূরের জীবনাহুতি, জহিরের ত্যাগের কতটুকু প্রতিদান দিতে পেরেছি আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে? কি স্বীকৃতি দিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁদের আত্মত্যাগের???


www.nagorikpathagar.org

# গোজাডাঙ্গার না ভুলা স্মৃতি

# ৪৪



www.nagorikpathagar.org

# ৭

পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী শহর বশিরহাট। শহরের প্রান্ত ঘেষে বয়ে চলেছে ইছামতি নদী। নদীর অপর তীরে গোজাডাঙ্গা BSF এর মোর্চা। BSF মোর্চা ছাড়িয়ে সীমান্ত বরাবর একটা বাধঁ। বাধঁ পেরিয়ে গেলেই সীমান্তের ওপারে ভোমরা বিওপি। বাধঁটাতে স্থাপন করা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্ভেদ্য ডিফেন্স। বাধেঁর অদূরেই একটি আম্রকুঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। কমান্ডার ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও একজন দুরধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা। প্রায় শ'পাচেঁক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে গোজাডাঙ্গা ক্যাম্প। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের ভেতর বাধেঁর উপর মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্ভেদ্য ডিফেন্সকে উৎখাত করার বারংবার হামলাকে ব্যর্থ করে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা সমুন্নত রেখেছে জানবাজ মুক্তিযোদ্ধারা। এপ্রিল মাস থেকে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থান থেকে অনেক চেষ্টা করেও খানসেনারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নামাতে পারেনি। তাদের প্রত্যেকটি আক্রমণকেই বিপর্যস্থ করে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা।

আমি তখন ৮নং সেক্টরে গেরিলা এ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছিলাম। হঠাৎ একদিন ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন জরুরী তলব করে পাঠাল। বনগাঁ হেডকোয়ার্টার্স থেকে বন্ধু ও সহযোদ্ধা সিএসপি কামাল সিদ্দিকীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম গোজাডাঙ্গায়। সেখানে পৌছে দুপুরের খাওয়া খেয়ে বসলাম আমি, সালাহ্উদ্দিন ও কামাল। জরুরী তলবের কারণ জিজ্ঞেস করলাম সালাহ্উদ্দিনকে। ও বলল, একটা কঠিন অপারেশনের কথা ভাবছে সে। ওই ব্যাপারে আমার সাথে পরামর্শ করার জন্যই ডেকেছে আমাকে। অপারেশনটা জটিল এবং দুরুহ।

ভোমরা থেকে ৫মাইল ভেতরে মাহমুদপুর গ্রামের স্কুল প্রাঙ্গনে পাক আর্মির কোম্পানী হেডকোয়ার্টার্স। সেটাকে রেইড করার কথা ভাবছে সালাহ্উদ্দিন। উত্তম প্রস্তাব। একটা শক্তিশালী Fighting Petrol নিয়েই এ অপারেশন করতে হবে। সালাহ্উদ্দিন মেনে নিল আমার প্রস্তাব। ঠিক হল ৫০জনের একটা Fighting Petrol নেয়া হবে। হাতিয়ার হিসেবে থাকবে এলএমজি, ষ্টেনগান এবং রকেটলাঞ্চার। দলের দুই-তৃতীয়াংশ দিয়ে গঠিত হবে ফাইটিং গ্রুপ। এক তৃতীয়াংশ দিয়ে গঠন করা হবে কভারিং গ্রুপ।



www.nagorikpathagar.org

গোয়েন্দাদের খবর অনুযায়ী ব্যাটালিয়ন হেডকোয়াটার্সকে পাহারা দিচ্ছে দু'টি প্লাটুন। হেডকোয়াটার্স কোম্পানীর তৃতীয় প্লাটুনটি এগিয়ে এসে বিওপি থেকে মাহমুদপুর যাবার একমাত্র রাস্তার উপরে পজিশন নিয়ে অবস্থান করছে। ঠিক হল মূল সড়ক দিয়ে যাওয়া হবে না। শত্রুপক্ষের ডিফেন্স এড়িয়ে সোজা টার্গেটে পৌছাতে হবে আমাদের।

বাধেঁর পর বিশাল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত দাতভাঙ্গার বিল। শ্বাপদসংকুল পদ্ম ও শাপলায় ছাওয়া দাতভাঙ্গার বিলের কোথাও কোমরপানি আবার কোথাও গলাপানি। জলজ উদ্ভিদের দাম ঠেলে নৌকায় যাওয়া সম্ভব নয়। যেতে হবে হেটে। বর্ষাকাল। বিলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের হদিস্ মেলা ভার। তার উপর দিয়ে হেটে পাড়ি দিতে হবে। সাথে অবশ্য থাকবে অভিজ্ঞ গাইড। বিপদসংকুল জেনেও এ পথই এখতিয়ার করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। এ পথে গেলেই সম্ভব হবে খানসেনাদের চোখে ধুলো দিয়ে টার্গেটে পৌছানো। ঠিক হল রাত দশটায় যাত্রা শুরু করা হবে। টার্গেট এট্যাক করা হবে শেষ রাতের দিকে।

দুপুরের পরই আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিল। সন্ধ্যার আগেই শুরু হল বৃষ্টি। কালো আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ও বজ্রের ঘনঘটা। ঝড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টি। এর মাঝেই যেতে হবে আমাদের। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের জন্য আল্লাহতা'য়ালার রহমত। এ ধরণের দুর্যোগ আমাদের টার্গেটে নিরাপদে পৌছাতে সাহায্য করে। ঠিক হল আমি হব ফাইটিং গ্রুপ কমান্ডার। সালাহ্উদ্দিন হবে কভারিং গ্রুপ কমান্ডার। যদি আমাদের কোন বিপদ ঘটে তবে কামালের নেতৃত্বে যাবে রি-ইনফোর্সমেন্ট; আমাদের সাহায্যার্থে।

সময়মত রাত দশটায় দুর্যোগের মধ্যেই বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু হল আমাদের যাত্রা। গাইড চলেছে আগে আর আমরা সবাই চলেছি নিঃশব্দে তার পেছনে। প্ল্যানিং করার সময় হেটে বিল পাড়ি দেবার ব্যাপারটা যত সহজ মনে করেছিলাম বাস্তবে ঠিক ততটাই কঠিন প্রতিপন্ন হল। অত্যন্ত দুর্গম পথ। কোমরপানি, গলাপানি, নিচে নরম কাদাঁ আর কাটার দাম। এর মধ্য দিয়ে নিজেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া অতি কষ্টকর। কাটাঁর আচঁড়ে পা দু'টি ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল। প্রথম প্রথম অসহ্য যন্ত্রনা হচ্ছিল। কিন্তু কিছুদুর অতিক্রম করার পর পা দু'টো প্রায় যেন চেতনাহীন হয়ে পড়ল। ফলে জ্বালা-যন্ত্রনা অনেকটা গা সহা হয়ে এল। মুখবুঝে এগিয়ে চলছিলাম। মাথার উপর কালো মেঘে ঢাকা আকাশ।



www.nagorikpathagar.org

বাতাসের শো শো শব্দ, আচমকা বিদ্যুৎ ও কানফাটা বর্জ্রের গর্জন। বিদ্যুৎ এর আলোয় আমরা পথ দেখে এগুচ্ছিলাম। পথের শেষ নেই। দুর্গম প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে এগিয়ে চলেছি আমরা এক আকাশ বৃষ্টি মাথায় করে। চারিদিকে অন্ধকার। ঝড়বৃষ্টির আলোড়ন, বিলের পানির ঢেউ এর ছলাৎছলাৎ শব্দ মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ। মাঝেমধ্যে আমাদের পায়ের শব্দে উড়ে যাচ্ছে দাম কুচড়িতে লুকিয়ে থাকা কোন নাম না জানা পাখি। পদ্ম-শাপলার ঝোপে কোথাও জ্বলছে আর নিভছে আলেয়া। এভাবে প্রায় চার ঘন্টা একনাগাড়ে হেটে আমরা বিল পেরিয়ে একটা গ্রামে এসে পৌছালাম। গ্রামের প্রায় সবগুলো বাড়িই দেখলাম খালি। গাইড জানালো বর্ডার এলাকার গ্রাম। খানসেনাদের অত্যাচারে সবাই পাড়ি দিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সীমান্তের ওপারে শরনার্থী শিবিরে। এ গ্রামটার পরেই মাহমুদপুর। রাত তখন দু'টোর বেশি। একটি খালি ঘরে আমরা সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার জন্য অবস্থান গ্রহণ করলাম। সে বাড়িটাকেই ঠিক করা হল আমাদের RV হিসেবে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমি ও সালাহ্উদ্দিন আরো দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম টার্গেট রেকি করতে। গাইড রয়েছে সাথে। ও আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। গভীর রাত তাই সমস্ত গ্রামটাতেই কেমন যেন একটা অদ্ভুত নিঃস্ত ব্দতা বিরাজ করছিল। দু'একটা কুকুর পথে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। এছাড়া কোন সাড়া শব্দ ছিল না। আমরা অতি সর্ন্তপণে এগিয়ে চললাম বাড়ি ঘরের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার পথ দিয়ে। আধঘন্টার মাঝেই পৌছে গেলাম মাহমুদপুর গ্রামের স্কুল ঘরের কাছে।

একটা দোচালা টিনের ঘর। ঘরটি দক্ষিনমুখী। সামনে একটি মাঠ। সেখানে রয়েছে ৭/৮টি তাবু। মাঠের প্রান্ত ঘেষে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা পশ্চিম দিকে সোজা চলে গেছে ভোমরা পর্যন্ত। রাস্তার পর রয়েছে একটি দিঘী। দিঘীর উত্তর পাড়টা মাঠের মুখোমুখি। বেশ উচুঁ। ঠিক করলাম ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা পার হয়ে ফাইটিং গ্রুপ পজিশন নেবে দিঘীর পাড়ে। সেখান থেকেই আচমকা হামলা পরিচালনা করা হবে রকেটলাঞ্চার এর সাহায্যে। কভারিং গ্রুপ ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তাকে কভার করে স্কুল ঘরের পশ্চিম এবং পূর্ব দিকে অবস্থান নিয়ে প্রস্তুত থাকবে যেকোন রি-ইনফোর্সমেন্ট এর মোকাবেলা করার জন্য। একই সাথে তারা খতম করবে পলায়নকারী খানসেনাদের। রেকি শেষে আমরা ফিরে এলাম RV-তে।



www.nagorikpathagar.org

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পৌছালাম টার্গেটে। আমি আমার দল নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে পৌছে গেলাম দিঘীর পাড়ের নির্দিষ্ট জায়গায়। সালাহ্উদ্দিনরা পৌছে গেল তার নির্দিষ্ট জায়গায়। রাত তখন পৌনে চারটা। সবাই শেষবারের মত যার যার হাতিয়ার চেক করে তাক করে থাকল চুড়ান্ত অর্ডারের জন্য। হুকুম দিলাম, ফা-য়া-র! সঙ্গে সঙ্গে দু'টো লাঞ্চার থেকে বেরিয়ে গেল দু'টি রকেট। অব্যর্থ নিশানা। সম্পূর্ণ স্কুলটা আগুনের পিন্ড হয়ে জ্বলে উঠল। একই সাথে এলএমজি-গুলো অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ করে চলল তাবুগুলো লক্ষ্য করে। রকেট লেগে তাবুগুলোতেও আগুন ধরে গেল। শত্রুদের মধ্যে মরণের হাহাকার শুনতে পেলাম। তাদের তরফ থেকে কিছু পাল্টা ফায়ারিংও হল। তবে সেটা অল্পক্ষণের জন্য। দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে দেখতে পেলাম। আহত ব্যক্তিদের যন্ত্রনার কাতরানিও শুনতে পেলাম। হঠাৎ করে সালাহ্উদ্দিনের গ্রুপের ফায়ারিং এর আওয়াজ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম পালিয়ে যাবার চেষ্টা যারা করছিল তাদের খতম করছে সালাহ্উদ্দিনের দল। টার্গেট নিউট্রেলাইজড হয়ে গেল। আমাদের দখলে চলে এল পুরো হেডকোয়াটার্স। কোম্পানী কমান্ডারসহ বেশ কয়েকটি মৃত সৈনিকের লাশ খুঁজে পেলাম। প্রায় ১১জন আহত সৈনিককে বন্দি করা হল। বিপুল পরিমান অস্ত্রশস্ত্র কব্জা করলাম আমরা। পূবের আকাশ তখন কিছুটা ফর্সা হয়ে এসেছে।

আমরা ফিরে এলাম আমাদের ক্যাম্পে। ফিরে এসে দেখি কামাল অধীর আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে আমাদের ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম আমাদের অপারেশনের আগুনের পিন্ড গোজাডাঙ্গার ক্যাম্প থেকেও দেখা গেছে পরিষ্কার। গোলাগুলির শব্দও শোনা গেছে। অপারেশনের সাফল্যে অতি উত্তম প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেদিন।

আমাদের রেইডের সাফল্যে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে পাক বাহিনী। প্রতিহিংসার জিঘাংসায় এক সপ্তাহের মধ্যে দু'দুবার ব্রিগেড এট্যাক পরিচালিত করে ওরা আমাদের গোজাডাঙ্গা ডিফেন্সের উপর। লোমহর্ষক সংঘর্ষ ঘটে। প্রচুর হতাহত হয় দু'পক্ষেই। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতিয়ারের নল অবিশ্রান্ত ফায়ারিং এর ফলে ফেটে চৌচিড় হয়ে যায়। তবুও পিছু হটেনি একজন মুক্তিযোদ্ধাও। প্রচন্ড আক্রমণকে প্রতিবারই বানচাল করে দেয় ওরা। বিশাল ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে দু'বারই হানাদার বাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যায়।



www.nagorikpathagar.org

মুক্তিযোদ্ধাদের এককথা - সবাই প্রাণ দেবে কিন্তু পিছু হটবে না কিছুতেই। বাংলার মাটিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা সমুন্নত রাখবে যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে। তাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, আত্মপ্রত্যয় ও অকুতোভয় চারিত্রিক দৃঢ়তার কাছে মাথা নিচু করতে বাধ্য হয়েছিল পরাক্রমশালী হানাদার প্রতিপক্ষকে।

সংগ্রামকালে মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে যে অসীম প্রাণশক্তি ও দেশপ্রেমের সৃষ্টি হয়েছিল তা স্বাধীন বাংলাদেশে স্বীকৃতি লাভ করেনি। ক্ষমতাসীন তৎকালিন সরকারের বিশ্বাসঘাতকতায় তারুণ্যের সেই অমূল্য জীবনশক্তিকে হতাশার অন্ধগলিতে পথভ্রষ্ট করে দেয়া হয় অতি কৌশলে। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাঝে মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ গড়ার কাজে না লাগিয়ে দলীয় স্বার্থ ও বিদেশী প্রভুদের নীল নকশা বাস্তবায়ন করার স্বার্থে '৭১ এর চেতনাকে নস্যাৎ করে দেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের চরিত্র হনন করে জাতীয় জীবনের মূল ধারা থেকে তাদের সরিয়ে রাখা হয়। সেই বিশ্বাসঘাতকতার জের জাতি বয়ে চলছে আজো। যারা জীবন বাজি রেখে দেশ স্বাধীন করেছে দেশের পুনর্গঠনের অধিকারও মূলতঃ হওয়া উচিত ছিল তাদেরই। কিন্তু তাদের সেই ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বঞ্চিত করার ফলে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে নিক্ষিপ্ত হয় অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের আবর্তে। যে আশা, আকাংখা ও স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে; অনেক ত্যাগের বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার সূর্য; সেই আশা-আকাংখা-স্বপ্ন আজও সুদূরপরাহত মরিচিকা মাত্র।


www.nagorikpathagar.org

# ধামাই অপারেশন

# ১১



www.nagorikpathagar.org

# ৭

কুলাউড়া এবং বড়লেখার মধ্যে অবস্থিত জুড়ি ভ্যালি। পাথারিয়া হিলস এর গা ছুঁয়ে জুড়ি ভ্যালি। সমস্ত ভ্যালিটাই ছোট-বড় টিলায় ভরা। টিলাগুলো ছেয়ে আছে সবুজ চা বাগানে। অনেকগুলো চা বাগানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জুড়ি ভ্যালি একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ। চা বাগানগুলোর মধ্যে ধামাই টি ষ্টেটটাই সবচেয়ে বড়। জুড়ি ভ্যালির মধ্যমণি ধামাই টি ষ্টেট। এই ষ্টেটে রয়েছে বড় আকারের একটি টি প্রসেসিং ফ্যাক্টরি। আশেপাশের চা বাগানের চাও প্রক্রিয়াজাত করা হয় এই ফ্যাক্টরিতেই। সিদ্ধান্ত নেয়া হল এটাকে ধ্বংস করতে হবে। কাজটি সহজ নয় মোটেও। গুরুত্বপূর্ণ এই ফ্যাক্টরিকে কার্যকর রাখার জন্য কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। জুড়ি বাজারে স্থাপন করা হয়েছে খানসেনাদের ক্যাম্প। সেখান থেকে পাক বাহিনী সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখছে ধামাই গার্ডেনের ফ্যাক্টরি এবং লাঠিটিলা বিওপি-র উপর। ফ্যাক্টরিটাকে ঘিরে থাকে প্রায় ৩০/৪০জন রাজাকারের একটি সশস্ত্র প্লাটুন। যেকোন অবস্থায় এই প্লাটুনকে সাহায্য করার জন্য সদা প্রস্তুত খানসেনারা। ফ্যাক্টরি ধ্বংস করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে গেরিলা কমান্ডার ফারুক, আতিক এবং মাসুক। ফারুক ও মাসুক জুড়ি ভ্যালির ছেলে। সমস্ত এলাকাটাই তাদের নখদর্পণে। আতিক বিয়ানী বাজারের ছেলে হলেও জুড়ি এলাকা সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। তাছাড়া আতিক একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট। বেশ কিছুদিন যাবৎ গুপ্তচরদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সব তথ্যই সংগ্রহ করা হয়েছে। ঠিক করা হয়েছে শনিবার রাতে অপারেশন চালানো হবে। কারণ, শনিবার রাত ক্লাব নাইট। সমস্ত অফিসাররা তাদের স্ত্রী ও বান্ধবীদের নিয়ে সে রাতে ক্লাবে পানাহার ও আনন্দফুর্তিতে মেতে থাকবে। তাদের সাথে যোগ দিবে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর অফিসারবৃন্দ। পরদিন ছুটি। ফ্যাক্টরি থাকবে বন্ধ। তাই নিরাপত্তায় নিয়োজিত পাহারাদারদের মধ্যে কিছুটা শিথিলতা থাকাটাই স্বাভাবিক।

জুড়ি বাজার থেকে প্রায় ১$^{১/২}$ কিলোমিটার দূরে একটি টিলার উপর ফ্যাক্টরি। চারিদিকে দেয়াল ঘেরা। একটি মাত্র গেইট। সেখানে রয়েছে সার্বক্ষণিক সশস্ত্র প্রহরী। গেটের ভিতর ফ্যাক্টরীর উঠোনে তাবু গেড়ে প্রহরীদের স্থায়ী থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাত দশটার মধ্যেই গার্ডেনের জেনারেটর বন্ধ করে দেয়া হয়। বৈদ্যুতিক আলো নিভে যাবার


www.nagorikpathagar.org

পর পুরো ভ্যালিটাই অন্ধকার হয়ে যায়। শনিবার রাতেই শুধু ব্যতিক্রম। সে রাতে জেনারেটর অন থাকে মাঝরাত এমনকি শেষরাত পর্যন্ত। তবে গার্ডেনের অন্যান্য জায়গায় বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র ক্লাবটাকেই আলোকিত করে রাখা হয় সে রাতে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লাব নাইট শেষ না হয়।

মেশিন ঘরটাকে চারিদিকে ঘিরে রয়েছে চা বাগান। ঠিক হলো আতিক ও ফারুক পরিচালনা করবে মূল অপারেশন। অপরদিকে মাসুকের নেতৃত্বে গেরিলাদের একটি দল আচমকা অভিযান চালাবে ক্লাবের উপর। এতে করে কর্তাব্যক্তিদের সবাই ক্লাববে মুক্তি বাহিনীর হাত থেকে বাচাঁতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ডেকে পাঠাবে খানসেনাদের বাজার থেকে। এভাবে সবাই যখন ক্লাব ও তাদের জীবন বাচাঁতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তখন ফারুক ও আতিক চালাবে তাদের মূল অভিযান। রাত ৯টায় ওরা সবাই যার যার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেল। রাত বারোটায় অপারেশন শুরু হবে। আমরা সবাই কুকিতল ক্যাম্পে অধীর আগ্রহে বারুদ ফাটার শব্দের প্রতিক্ষায় বসে থাকলাম। আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরত্বে ফ্যাক্টরি। সেখানে বিস্ফোরণ ঘটলে সেটা সহজেই শুনতে পাব। গোলাগুলির আওয়াজও শুনতে পাব পরিষ্কার। রাত বারোটা বাজার বেশ আগেই ফারুক ও আতিক তাদের দল নিয়ে ফ্যাক্টরির গেটের কাছে পৌঁছে গেল। গেটের অল্প দূরে চা ঝোপের ভেতর অবস্থান নিল তারা। গেটে পাহারা দিচ্ছে একজন সেন্ট্রি। সেন্ট্রিকে নিঃশব্দে খতম করতে হবে কমান্ডো কায়দায়। আতিককে সঙ্গে নিয়ে ফারুক অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে সরে গিয়ে অবস্থান নিল প্রাচীরের এক প্রান্তে। বাকি সবাই নিঃস্তব্দ হয়ে বসে থাকল চা ঝোপের ভিতরে। প্রাচীরের প্রান্তে পৌঁছে ফারুক আতিককে নিচু গলায় বলল, "তুই আমাকে কভার কর; আমি যাচ্ছি সেন্ট্রিকে খতম করার জন্য।" আতিক তার ষ্টেনগান নিয়ে তৈরি হল। ফারুক তার ষ্টেনগানটাকে পিঠের উপর ফেলে ধারালো কমান্ডো ড্যাগারটা হাতে নিয়ে শিকারী বেড়ালের মত নিঃশব্দে ক্রলিং করে এগিয়ে চলল দেয়ালের গা ঘেষে। আতিক তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করতে থাকল সেন্ট্রির গতিবিধি। ফারুক ক্রলিং করছে কিছুদুর আর থামছে। এভাবে সে পৌঁছে গেল সেন্ট্রিটার কাছে। সেন্ট্রি কিছুই টের পেল না। ফারুকের কাছ থেকে সেন্ট্রির অবস্থান মাত্র চার-পাচঁ হাত। হঠাৎ আচমকা উঠে পেছন থেকে ফারুক একহাতে চেপে ধরল সেন্ট্রির গলা আর আরেক হাতে ঢুকিয়ে দিল কমান্ডো ড্যাগারটা তার পেটে। মৃত্যু যন্ত্রনায় অস্পষ্টভাবে আর্তনাদ করে



www.nagorikpathagar.org

উঠল সেন্ট্রি কিন্তু ফারুকের শক্ত হাতের নিষ্পেষণে তার গলা থেকে কোন শব্দ বেরুল না। ফারুক নিঃশব্দে তাকে টেনে নামিয়ে আনলো একটা চা ঝোপের মধ্যে। আতিক ততক্ষণে দলের অন্যান্যদের নিয়ে এসেছে ফারুকের জায়গায়। ফারুকের পাশেই পড়ে আছে সেন্ট্রির নিথর দেহ। ভেতরের পাহারাদারদের কেউই কিছু আঁচ করতে পারল না। এরপর অতি সহজেই ওরা ঢুকে পড়ল ফ্যাক্টরিতে। তাবুতে ঘুমন্ত অবস্থায় বাকি রাজাকারদের নিরস্ত্র করতে তাদের কোন বেগ পেতে হল না। তাদের নিরস্ত্র করে ওরা তড়িৎ গতিতে বারুদ লাগাতে লাগল মেশিন ঘরে আতিকের নির্দেশনায়। হঠাৎ রাতের নিঃস্তব্দতা ভেদ করে শোনা গেল ফায়ারিং এর আওয়াজ। ওরা বুঝতে পারল এ ফায়ারিং করছে মাসুকের দল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চার্জ লাগানোর কাজ শেষ হল। আতিক সবকিছুর তদারক করে press করল ডেটোনেটর। বিষ্ফোরণের বিকট শব্দে কেপেঁ উঠল পুরো ভ্যালিটা। আর একই সাথে একটা আগুনের কুন্ডলী হয়ে উড়ে গেল ধামাই ফ্যাক্টরি। পুরো মেশিনঘরটা ভেঙ্গে গুড়িয়ে পরিণত হল কংক্রীট ও লোহা-লক্করের একটা আবর্জনা স্তুপে। আমরা শুনতে পেলাম বিষ্ফোরণের প্রচন্ড শব্দ। বুঝলাম অপারেশন সফল হয়েছে। বিষ্ফোরণের কিছুক্ষণ পর ক্লাবের দিক থেকে ফায়ারিং এর আওয়াজও থেমে গেল। ভোর পাচটাঁর দিকে ওরা সবাই ফিরে এল ক্যাম্পে বিজয়ী হয়ে। পূবের আকাশে উষার আলোকে তখন রাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

'৭১ এর জানবাজ দামাল মুক্তিযোদ্ধারা আজ অসহায়, নিঃস্তেজ, দুর্বল। নেতিবাচক হতাশার আবর্তে নিষ্পেষিত, জীবনযুদ্ধে পরাজিত, রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়ে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তি ও দেশ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। এ ব্যর্থতার দায়মুক্ত হবার জন্য সমস্ত চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে জনগণের মুক্তি সংগ্রামে '৭১ এর চেতনায় আবার তাদের এগিয়ে আসতে হবে অগ্রণীর ভূমিকায়। ১৪ কোটি দেশবাসীকে দেখাতে হবে মুক্তির পথ, সত্যের পথ, সাম্যের পথ। জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি নেতিবাচক চিন্তা-চেতনার উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার রাহুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে আবার তাদের ইতিবাচক ভূমিকা রাখার অঙ্গিকারের শপথ নিতে হবে। এ দায়িত্ব গ্রহণের ব্যর্থতা দেশ ও জাতির অস্তিত্বকে করে তুলবে বিপন্ন। ভবিষ্যত হয়ে উঠবে অনিশ্চিত।


www.nagorikpathagar.org

# মৃত্যুর মুখোমুখি

# ৭৭


www.nagorikpathagar.org

# ৭

জুলাই এর শেষ। পাথারিয়া হিলস, জুড়ি, বরলেখা, বিয়ানী বাজার, শেওলা উপত্যাকার বেশিরভাগ অংশ এমনকি লাঠিটিলার অধিকাংশ মুক্তি বাহিনী দখল করে নিয়েছে। কিছুদিন আগে লাঠিটিলা বিওপি-তে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিল বীর মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতার মুখে পাক বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

হঠাৎ গাইড শামছু মিঞা খবর নিয়ে এল, কুলাউড়া থেকে বিপুল সংখ্যক খানসেনা ও সাজোঁয়া বহর এনে জড়ো করা হয়েছে জুড়িতে। বুঝতে অসুবিধা হল না কিছুদিন আগে লাঠিটিলার যুদ্ধে মুক্তি বাহিনীর হাতে অপদস্থ হয়ে পিছু হটার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য খানসেনাদের রি-ইনফোর্সমেন্ট ডেকে পাঠানো হয়েছে মুক্তিফৌজের দাতভাঙ্গা জবাব দেবার জন্য। খবরটা শোনার পরপরই শামছু মিঞার সাথে আমি নিজেই ছদ্মবেশে গেলাম রেকি করার জন্য। খবরটা সত্যি। প্রায় দু'টো নতুন ব্যাটালিয়ন ও এক স্কোয়াড্রন ট্যাঙ্ক আনানো হয়েছে। জুড়ি বাজারের প্রান্ত ঘেসেঁ তাবু গেড়েছে ওরা। ওখান থেকেই সুযোগ বুঝে আঘাত হানা হবে মুক্তি বাহিনীর অবস্থানের উপর। পাক বাহিনীর হামলার ব্যাপক প্রস্তুতি দেখে চিন্তিত হয়ে উঠলাম। তাদের বিশাল এ শক্তির মোকাবেলা করে সম্মুখ সমরে টিকে থাকা মুক্তি বাহিনীর জন্য হবে প্রায় অসম্ভব। ফিরে এসে সবাইকে ডেকে অবস্থার ব্যাখা দিয়ে কি করা উচিৎ সে ব্যাপারে তাদের অভিমত চাইলাম। নিজেদের অবস্থান ছেড়ে যেতে চাইল না কেউ। সবার এক কথা। প্রাণ দিতে রাজি কিন্তু পিছু হটবো না। কোন যুক্তি দিয়েই ওদের বোঝাতে পারলাম না খানসেনাদের শক্তিশালী আক্রমণের মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সে অবস্থার বিবরণ পাঠিয়ে দিলাম। ওখান থেকে হুকুম এল - স্থানীয় কমাণ্ডার হিসেবে অবস্থার পর্যালোচনা করে আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনে পিছনে হটে আসার সম্মতি দেয়া হল হেডকোয়ার্টার্স থেকে। কিন্তু আমার সমস্যা হল মুক্তি ফৌজের দামাল যোদ্ধাদের নিয়ে। খানসেনাদের সম্মুখ সমরে পরাজিত করে যে জায়গা তারা দখল করেছে সে জায়গা কিছুতেই ছেড়ে পিছু হটবে না তারা। তাদের মনোবল ও চারিত্রিক দৃঢ়তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলাম আমি। কিন্তু একজন অভিজ্ঞ কমাণ্ডার হিসেবে তাদের আবেগের জোয়ারে ভেসে গেলে চলবে না। যে করেই হোক



www.nagorikpathagar.org

খানসেনাদের আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেবার রাস্তা খুজেঁ বের করতেই হবে আমাকে। অনেক চিন্তার পর ঠিক করলাম পাক বাহিনীর আক্রমণের আগেই ওদের উপর আচমকা আক্রমণ চালিয়ে ওদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে হবে Assembly Area-তেই। এ ধরণের অতর্কিত আক্রমণকে বলা হয় Spoiling Attack। ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে তুলানামূলক বৃহৎ শক্তির আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের অবস্থানকে বাচাঁনোর জন্য এ ধরণের অভিযান পরিচালনার বিধান রয়েছে যুদ্ধশাস্ত্রে। Spoiling Attack-ই করতে হবে আমাকে। রেকি থেকে ফিরেই সিদ্ধান্ত নিলাম ছেলেদের সাথে আলোচনার পর।

হেডকোয়াটার্স এর মাধ্যমে মিত্র বাহিনীর আর্টিলারী কভারের অনুরোধ পাঠালাম। জবাবে বলা হল, মাউন্টেন আর্টিলারীর রেঞ্জের বাইরে টার্গেট বিধায় কভারিং ফায়ার পাওয়া যাবে না। এ জবাব পাবার পর অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য নিজেদের কাছে যা আছে তা নিয়েই প্রস্তুতি পর্ব শুরু করলাম। ভারী হাতিয়ারের মাঝে আমাদের কাছে রয়েছে পাক বাহিনী থেকে captured কয়েকটি ৩" মর্টার ও কয়েকটি .৩০ ভারী মেশিনগান। চাচামিয়া হিসেবে পরিচিত কুকিতল ক্যাম্পের বিডিআর-এর নায়েব সুবেদার মতিউর রহমান বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ৩" মর্টার ও .৩০ ভারী মেশিনগানের উপর প্রশিক্ষন নেয়া ছিল তার। ছেলেদের মাঝ থেকে বেছে বেছে শিক্ষিতদের নিয়ে দু'টো ডিটাচমেন্ট তৈরি করে তাদের প্রশিক্ষন দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হল ফ্লাইট ল্যাফট্যানান্ট কাদের ও চাচামিয়ার উপর। সময় মাত্র একরাত। এর মধ্যেই লেয়িং, ফায়ারিং, ডাটা প্রসেসিং এর সব কাজ শিখে নিতে হবে ওদের। ঠিক করলাম আমাদের ডিফেন্সেই স্থাপিত হবে Gun position। সেখান থেকে প্রায় ১মাইল এগিয়ে গিয়ে স্থাপন করা হবে Ovservation Post (OP)। Ovservation Post এবং Gun position এর মধ্যে তার বিছিয়ে কমিউনিকেশন লাইন স্থাপন করা হবে। টেলিফোনের মাধ্যমে ফায়ার পরিচালনা করতে হবে গোপনীয়তা বজিয়ে রাখার সার্থে। সিদ্ধান্ত নেয়া হল, অবজারভার হবো স্বয়ং আমি। মর্টার ফায়ারের সাথে সাথে বাবু ও খোকনের নেতৃত্বে দু'টো কোম্পানী শত্রুপক্ষকে আঘাত হানবে দুই ফ্ল্যাংক থেকে। জুড়ি ও কুলাউড়া সড়কে এ্যাম্বুস লে করবে মাসুক ও ফারুক তৃতীয় কোম্পানী নিয়ে। তাদের কাজ হবে পলায়নরত খানসেনাদের নিধন করা এবং একইসাথে কুলাউড়া থেকে যেকোন


www.nagorikpathagar.org

খানসেনাদের জুড়িতে আসতে বাধা দেয়া। সন্ধ্যার পর আমি, শামছু মিঞা ও কটুইমনা একটি ছোট্ট Protection Party নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম OP নির্ধারন করতে। পাহাড়ি জঙ্গলে একটি বড় গাছের উপর OP-এর জায়গা নির্ধারন করা হল। গাছটার সঙ্গে বাশের সাথে বাশ জোড়া দিয়ে উঠার ব্যবস্থা করা হল। সেখান থেকে Gun position পর্যন্ত টেলিফোনের তার লে করা হল। সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফিরে এলাম আমরা। অতি প্রত্যুষে আমাদের আক্রমণ শুরু হবে। রাতেই সবাই চলে গেল যার যার অবস্থানে। শেষ রাতে আমি, কটুইমনা এবং আতিকের কমাণ্ডে ছোট্ট একটা Protection Party নিয়ে পৌছালাম OP-তে। গাছে উঠে বসলাম আমি ও কটুইমনা। সেদিন সে শুধু আমাদের গাইডই নয়; টেলিফোন অপারেটরের দায়িত্বও পালন করেছিল। গাছে উঠে দু'জনে পাশাপাশি বসলাম। ও আমার ডানদিকে। মাঝে একটা বড় মোটা ডাল। টেলিফোনের বোঝাটা ওর পিঠে আর আমার হাতে রিসিভার। হাজার দুই গজ দুরত্বে শত্রুপক্ষের Assembly Line। আমাদের অবস্থান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় বাইনোকুলারের সাহায্যে। টেলিফোনের connection check করলাম।

-হ্যালো; Gun position, how do you hear me? Over.

-OP1: you are loud and clear. পরিষ্কার শুনতে পেলাম নায়েব সুবেদার মতিউর রহমানের আওয়াজ।

-All Ok; Out. যোগাযোগ ব্যবস্থা চেক করে চুপচাপ বসে রইলাম। আক্রমণ পরিচালনা করার সময় হতে এখনো ১৫মিনিট বাকি। নিচে আতিক ও তার পার্টি পজিশন নিয়ে রয়েছে।

নির্জন রাতে পাথারিয়া হিলস এর গভীর জঙ্গলে উচুঁ গাছের মগডালে বসে নিশি রাতের ঘুমন্ত প্রকৃতির শোভা দেখে দেখে সময় কাটাচ্ছিলাম। বর্ষাকাল। চারিদিকে ভেজা মাটির গন্ধের সাথে একটা গুমোটভাব। আকাশজুড়ে ভাসমান মেঘের টুকরোগুলো ইতঃস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে। মেঘের ফাঁকে উকি দিয়ে আছে কৃষ্ণপক্ষের একফালি বাকা চাঁদ। মৃদুমন্দ হাওয়ার ঝাপটায় হিল্লোলিত বাশের ঝাড় ও গাছের পাতায় আওয়াজ হচ্ছে। চারিদিকে চাঁপ চাঁপ গারো অন্ধকার। অন্ধকারের বুক চিরে ছোট্ট একটা পাহাড়ি ছড়ার



www.nagorikpathagar.org

পারে জ্বলছে আর নিভছে একঝাঁক জোনাকী। একটানা শোনা যাচ্ছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। মাঝেমধ্যে শুনতে পাচ্ছিলাম বেসুরো ব্যাঙের ডাক। হঠাৎ করে ডানা ঝাপটা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে নিশাচর নাম না জানা কোন পাখি। সবকিছু মিলিয়ে নিরেট স্তব্দতা। সবাই নিজ নিজ অবস্থানে চুপচাপ বসেছিলাম। হঠাৎ পূব আকাশে প্রথম ঊষার আলো দেখা দিল। ক্রমশঃ অন্ধকার ফিকে হয়ে এল চারিদিকে। আমাদের টিলার সামনেই ছোট্ট একটি টিলার উপর একটি বাংলো। চা বাগানের কোন বাবু থাকেন সে বাংলোয়। সমস্ত বাংলোটাই অঘোর ঘুমে অচেতন। দূরে শত্রুপক্ষের Assembly Area। বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখলাম পুরো এলাকা ছেয়ে আছে তাবুতে। একপাশে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে চারটি ট্যাংক। নির্ধারিত সময় হয়ে এল। শেষবারের মত প্রয়োজনীয় চেকআপ সম্পন্ন করে টেলিফোন সেট হাতে তুলে নিলাম।

-হ্যালো, GPO (Gun Position Officer) OP1 here, how do hear me? Over.

-OP1: you are loud and clear. Go ahead. Over. জবাব দিল সুবেদার মতিউর রহমান চাচামিয়া।

-Take post. Over.

-Take post. উচ্চস্বরে চাচামিয়া তার ডিটাচমেন্টের সদস্যদের হুকুম দিলেন। টেলিফোনে শুনতে পেলাম পরিষ্কার।

-Tgt enemy Assembly area. Range 2500 fire. over.

শুরু হল Tgt ranging। কয়েকমিনিট পর ঘুমন্ত প্রকৃতি কেঁপে উঠল মর্টারের গর্জনে। আমার উপর দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে উড়ে গেল একটি শেল। শেলটি গিয়ে পড়ল Tgt থেকে কিছুটা দূরে। বাইনোকুলার দিয়ে center of impact observe করে প্রয়োজনমত correction পাঠিয়ে দিলাম গান পজিশনে। এবারের গোলাটি পড়ল Tgt থেকে কিছুটা short। আবার correction পাঠালাম। ফায়ার করা হল তৃতীয় গোলা। এবারেরটা পড়ল ঠিক Tgt এর উপর। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলাম "Round on tgt. Volley fire"। এবার এক সাথে গর্জে উঠল ছয়টি মর্টার। শত্রু শিবিরে তখন দস্তুর মত হৈ চৈ পড়ে গেছে। গোলার আঘাতে ঘায়েল হয়েছে দু'টি ট্যাংক। তাবুগুলোতে আগুন ধরে গিয়েছে। আচমকা গোলার শব্দে জেগে উঠা খানসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণের



www.nagorikpathagar.org

দায়ে এলোপাথারী দৌড়াচ্ছে। হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ছে বেশিরভাগই, গোলার আঘাতে। এর মধ্যেই শুনতে পেলাম মেশিনগান আর এলএমজি ফায়ারিং এর শব্দ। ফারুক ও বাবুর দল আক্রমণ চালিয়েছে দুই ফ্ল্যাংক থেকে। বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখতে পেলাম Tresser Bullets-গুলো জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের মত ঝাঁকে ঝাঁকে গিয়ে পড়ছে শত্রুপক্ষের উপর। হঠাৎ বিষ্ফোরণের শব্দ ভেসে এল টার্গেট এরিয়া থেকে। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের হলকা ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা দিল দিগন্তে। নিশ্চয়ই শত্রুর অ্যামুনিশন ডাম্পে গোলা গড়েছে। সমস্ত এ্যাসেম্বলী এরিয়াটাই তখন একটা নরকে পরিণত হয়েছে। দাউদাউ করে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে পোড়া বারুদের গন্ধে। কিছু খানসেনা ছুটে পালাচ্ছে পিছুপানে। ওরা কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। মাসুকের এ্যাম্বুসে প্রাণ যাবে ওদের সবার। যা ভাবলাম ঠিক তাই হল। অল্পক্ষণ পরেই দূরে অটোমেটিক ফায়ারিং এর আওয়াজ শুনতে পেলাম। এ ফায়ারিং করছে মাসুক ও তার দল। মাথার উপর দিয়ে মর্টার শেলগুলো আকাশ চিরে ছুটে যাচ্ছে অবিরাম। আক্রমণের সাফল্যে আমরা সবাই খুশি। একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করছিলাম। টেলিফোনে গান পজিশন অফিসারকে জানালাম,

-Well done. Continue firing. Tgt being nutrahaed and destroyed. Congratulation. শেষ বাক্যটি শেষ করার আগেই বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। আচমকা গর্জে উঠল শত্রুপক্ষের একটি ১২০ মিমি মর্টার। গোলাটা শাঁ শাঁ শব্দে এসে ফাটল আমাদের গাছটা থেকে কয়েকহাত দূরে। Air burst fuge. স্প্লিন্টারের আঘাতে একটা বিশাল গাছ কাত হয়ে পড়ল মাটিতে। মুহূর্তে বুঝতে পারলাম আমাদের OP ডিটেক্ট করে ফেলেছে শত্রুপক্ষ। টেলিফোনে বললাম,

-OP identified. Continue firing. We are abundaning OP. তারপরই হুকুম দিলাম,

-Abundon OP. শেষ করতে পারলাম না। দ্বিতীয় গোলাটা এসে burst করল ঠিক আমাদের গাছের উপর। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল এলাকাটা। বা হাতের সেটটা উড়ে গেল। পরক্ষণেই অনুভব করলাম হাতটা ভিষণ গরম হয়ে উঠেছে। পোড়া বারুদের গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠেছে। চোখও জ্বলছে বারুদের ঝাঁঝে। হাতের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখলাম আমার হাত থেকে তাজা গরম রক্ত পড়ছে গলগল করে। বা হাতের



www.nagorikpathagar.org

তালুটা ফুটো হয়ে গেছে। বুড়ো আঙ্গুলটা স্প্লিন্টারের ঘায়ে উড়ে গেছে টেলিফোন রিসিভারের সাথে। হাতের প্রথম আঙ্গুলটার অর্ধেক আছে, বাকিটা নেই। কানি আঙ্গুলটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ঝুলছে। প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হল। মুহূর্তে পাশে বসা কটুইমনার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে আমি আতংকে শিউরে উঠলাম। ওর ডানহাত ও ডানপাটা কাঁধ ও উরু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে গেছে গোলার আঘাতে। সে অবস্থাতেও কটুইমনা একহাত দিয়ে আমাদের মধ্যবর্তী ডালটা আকড়ে ধরে আছে। চোখে বিহবল এক অদ্ভুত দৃষ্টি। ক্ষণিকের ব্যাবধানে ওর হাত ফসকে গেল। নিচে পড়ে গেল কটুইমনা। আমিও কোনমতে একহাতে বাঁশ ধরে নিচে পিছলে নেমে এলাম। কটুইমনার অবস্থা দেখে আতিকরা সবাই ভড়কে গেছে। দু'তরফ থেকেই অনবরত গোলাগুলি আমাদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে; পড়ছে এখানে সেখানে। আমি তড়িৎ গতিতে কোমরের গামছাটা খুলে হাতে জড়িয়ে গলার সাথে হাতটাকে ঝুলিয়ে কটুইমনার বিকৃত দেহপিণ্ডটা ডানকাধে তুলে নিয়ে হুকুম দিলাম,

**-Lets move.**

কিছুতেই এগুতে পারছিলাম না। অনবরত শত্রুপক্ষের গোলা এসে পড়ছে। কোনমতে কখনো হেটে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ একটা মেশিনগানের লাইন অফ ফায়ারের আওতায় পড়ে গেলাম আমি। তিনটি গুলি আমার বাম কাঁধ ভেদ করে বাম কলার বোনটা গুড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। গুলির আঘাতে ঝুলে পড়ল বাম কাঁধটা। কাঁধের ক্ষত থেকেও রক্ত ঝরা শুরু হল। তাজা গরম রক্ত। অসহ্য ব্যথায় কুকড়ে উঠলাম। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম দাতে দাত চেপে। কমাণ্ডার হয়ে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আমার অবস্থা দেখে আতিক হাউমাউ করে কেঁদে ছুটে এল। আমি ওকে সান্ত না দেবার জন্য বললাম,

**-Don't worry. Everything would be fine. Lets go.**

কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর বুঝতে পারলাম কটুইমনার দেহটা নিথর হয়ে গেছে। মারা গেছে আমাদের সবার প্রিয় দুর্ধর্ষ গাইড, এলাকার নামকরা চোরাকারবারি বীর মুক্তিযোদ্ধা কটুইমনা। "**he has passed away.**" অনেকটা স্বগোক্তির মত কথাটা বলে ওর প্রাণহীন দেহটা নামিয়ে রাখলাম কাঁধ থেকে। গোলাগুলি চলছে চারিদিকে অবিশ্রান্তে। প্রচুর রক্তক্ষরণ ও অসহনীয় যন্ত্রনায় আমার অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছে



www.nagorikpathagar.org

ক্রমাগত। নিস্তেজ হয়ে আসছে শরীর। এ অবস্থায় দুর্গম পথ চলে গন্তব্যস্থলে পৌছানো অসম্ভব। আমি একটা নিরাপদ জায়গায় বসে পড়লাম। আমাকে থামতে দেখে সাথের মুক্তিযোদ্ধারা কভার নিয়ে মাটিতে পজিশন নিল। নিজের জন্য সহযোদ্ধাদের জীবন বিপন্ন হোক সেটা কিছুতেই কাম্য নয়। একজনের জন্য সবাই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে থাকবে সেটা অযৌক্তিক। নির্দেশ দিলাম তোমরা সবাই চলে যাও। আমি আর চলতে পারছি না। জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। আমাকে এখানে রেখে তোমরা চলে যাও বেইস ক্যাম্পে। কিন্তু আমার সে নির্দেশ মেনে নিল না কেউ। কেঁদে ফেলল আতিক। আমাকে ছেড়ে একপাও নড়বে না কেউ। মরতে হয় সবাই মরবো একত্রে। আমার প্রতি তাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা চোখে প্লাবন ডেকে আনল। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললাম,
-আতিক, সবাই একসাথে মরে কোন লাভ নেই। ঠিক আছে, আমাকে বাঁচাতেই যদি চাও তবে আমাকে এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত কর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।
আমার এ আবেদন মেনে নিল আতিক। বাকিদের আমার পাহারায় মোতায়েন করে ক্ষিপ্রগতিতে পাথরের নিচে নেমে গেল আতিক। চারিদিকের গোলাগুলির কোন তোয়াক্কাই করল না সে। আমি তখন নিশ্চুপ বসে বসে আল্লাহ্‌পাকের কাছে পানাহ্‌ চাইছিলাম, "মাবুদ, গাফুরুর রাহিম আমাকে বাঁচাও। স্বাধীনতার সূর্যোদয় যাতে দেখার সৌভাগ্য হয় আমার।"

মুক্তিযোদ্ধা বাচ্চু গামছা দিয়ে আমার কাধঁ চেপে ধরে আছে। নিমিষেই ভিজে যাচ্ছে গামছা, গরম রক্তের প্রবাহে। সেটাকে চিপে নিয়ে আবার সে চেপে ধরছে আমার ক্ষতে। রক্তক্ষরণ বন্ধ হবার কোন লক্ষণই নেই। এমন জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে যে শক্ত করে বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার কোন উপায় নেই। একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি। সবকিছু সহ্য করে মনোবল ঠিক রাখতে হবে। বাচ্চুর কোলে মাথা রেখে চোখ বুঝে আল্লাহ্‌তা'য়ালার করুণা ভিক্ষা করছিলাম। সে পরিস্থিতিতে এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো কিছু করার ছিল না। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ লোকজনদের শোরগোল শুনতে পেলাম। মুক্তিযোদ্ধারা সতর্ক হয়ে উঠল। নাহ্‌। খানসেনারা নয়। আতিক ফিরেছে ৫/৬ জন লোক ও একটি মই নিয়ে। এরা সবাই কৃষক। ক্ষেতে কাজ করছিল। গোলাগুলি শুরু হতেই বাংকারে অবস্থান নিয়েছিল। মুক্ত এলাকায় জনগণকে নিরাপদ রাখার এ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরাই ওদের শিক্ষিত করে তুলেছিলাম। কারণ এ ধরণের গোলাগুলি বর্ডার সংলগ্ন


www.nagorikpathagar.org

এলাকায় প্রায় নৈত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। মইটিকে স্ট্রেচার বানানো হল। আমাকে সেটায় শুইয়ে দিয়ে ওরা মইটাকে কাধেঁ তুলে নিয়ে রওয়ানা হল।

পদযাত্রার ঝাকুঁনিতে ভিষণ ব্যথা হচ্ছিল। মাঝেমাঝে মনে হচ্ছিল প্রাণটা বোধ হয় এক্ষুণি বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কিছু করার ছিল না সবকিছু মুখ বুঝে সহ্য করে নেয়া ছাড়া। কোন এক পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান হল তখন আমি কুকিতল টি গার্ডেনের ডিসপেনসারিতে। আমার ক্যাম্পের কম্পাউন্ডার ও গার্ডেনের ডাক্তার সুই-সূতা দিয়ে আমার ক্ষতের মুখ বন্ধ করে রক্তক্ষরণ কমাবার চেষ্টা করছে। তাদের সুই এর খোচাঁতেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলাম। সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যেতে হবে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত মাসিমপুর ভারতীয় সেনা বাহিনীর সিএমএইচ-এ। যেতে হবে গাড়ি করে। কিন্তু রাস্তার যে অবস্থা তাতে জিপে করে আমাকে নেয়া সম্ভব হবে না। গাড়ির ঝাকুনি সহ্য করার মত শারীরিক অবস্থা তখন আমার নেই। সবাই ঠিক করল বাগানের ম্যানেজার মিঃ ঘোষের প্রাইভেট কারটা চেয়ে নিতে হবে আমাকে বহন করার জন্য। ভদ্রলোক বাঙ্গালী। সানন্দে রাজি হলের তার গাড়ি দিতে। শুধু তাই নয়; তিনি নিজেই আমাকে নিয়ে যাবেন গাড়ি চালিয়ে। গাড়ির সামনের সিট খুলে জায়গা করা হল; যাতে আমাকে শুইয়ে নেয়া যায়।

গাড়ির ভেতর যতটুকু সম্ভব আরামদায়ক শয্যা পেতে আমাকে শুইয়ে দেয়া হল। আতিক বসল আমার মাথা কোলে নিয়ে। ডাক্তার ও কম্পাউন্ডার রইল সাথে। মিষ্টার ঘোষ গাড়ির ষ্টিয়ারিং এ বসে গাড়ি ছেড়ে দিলেন। অভিজ্ঞ চালক তিনি। রাস্তার প্রতিটি বাঁক তার নখদর্পণে। অতি সতর্কতার সাথে উল্কাবেগে গাড়ি চালাচ্ছিলেন মিঃ ঘোষ। আমি অসাড় হয়ে শুয়েছিলাম। ডাক্তার সাহেব ও কম্পাউন্ডার ক্ষতের উপর কাপড় চেপে ধরেছিলেন। কাপড় ভিজে উঠলে সেটা চিপে নিচ্ছিলেন সাথে রাখা বালতিতে। রাস্তা যেন কিছুতেই শেষ হচ্ছিল না। এক একবার মনে হচ্ছিল আর হয়তো বা বাচঁবো না। চোখের কোন থেকে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রুধারা। আতিক বিড়বিড় করে পড়ছিল দোয়া-কালাম। অবচেতন মনে হঠাৎ করে ভেসে উঠল আমার আম্মার প্রতিচ্ছবি। তিনি যেন জীবন্ত হয়ে সামনে এসে দাড়ালেন! আমাকে বললেন, "তুই ঘাবড়াসনে; কিচ্ছু হবে না তোর। আল্লাহ্ তোকে নিশ্চয়ই সুস্থ্য করে তোলবেন। একটুখানি সবুর কর। মনে নেই ডাক্তার



www.nagorikpathagar.org

সাহেব তোকে কি বলেছিল, রক্তক্ষরণে সহজে মৃত্যু হবে না তোর।" এ কথা বলেই তিনি আমার বুকে ফুঁ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আচমকা আমি ডেকে উঠলাম, "আম্মা"। আমার অস্ফুট কণ্ঠস্বরে আতিক মাথা ঝুঁকে আমায় শুধালো,

-হক ভাই, কিছু বলছেন?

-না কিছু না। বলে জবাব দিলাম। আম্মার কথাই ঘুরে ফিরছিল মনে। তাইতো মনে পড়ছে। আমি তখন ইন্টারমেডিয়েটের ছাত্র। আমরা তখন কুমিল্লাতে। একদিন সন্ধ্যায় টাউন হলে বন্ধুদের নিয়ে নাটক দেখছিলাম। হঠাৎ নাটক বন্ধ করে দিয়ে মাইকে জরুরী ঘোষণা দেয়া হল একটি মেয়ের জীবন বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন। তার গ্রুপের রক্ত নেই হাসপাতালে। রক্ত পাওয়া না গেলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না কিছুতেই। ঘোষণা শোনার পর বন্ধুদের সঙ্গে করে সোজা গিয়ে উপস্থিত হলাম জেলা সদর হাসপাতালে। জরুরী বিভাগে গিয়ে খোঁজ করে জানতে পারলাম, গার্লস কলেজের একটি মেয়ের শরীরে জরুরী ভিত্তিতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরীন রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে হঠাৎ করে। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। টাকার জোড় রয়েছে। মেয়ের বাবা তাকে ঢাকায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। কিন্তু অবস্থার কিছুটা উন্নতি না হওয়া অব্দি তাকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর নয়। অবস্থার উন্নতির জন্য চাই রক্ত। রক্তের ব্যবস্থা হলে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করবেন ডাক্তাররা। আমরা সবাই ভলান্টিয়ার হলাম রক্ত দেয়ার জন্য। ডাক্তার সাহেব আমাদের সবার রক্ত পরীক্ষা করে বললেন, আমার ব্লাডগ্রুপ 'ও' পজেটিভ। তাই শুধু আমার রক্তই মেয়েটিকে দেয়া যাবে। আমি এতটুকু দ্বিধা না করে বললাম, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রক্ত তিনি আমার শরীর থেকে বের করে নিতে পারেন। প্রায় ২ পাইন্ট রক্ত সেদিন আমার শরীর থেকে নেয়া হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার আগে ডাক্তার সাহেব আমাকে বলেছিলেন, "নিয়মিত রক্তদান করার মাঝে অনেকগুলো সুফল আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে, যার মধ্যে রক্তদানের অভ্যাস থাকে সে রক্তক্ষরণে মারা যায় না।" তার সেই কথাটা বাসায় ফিরে প্রসঙ্গক্রমে আম্মাকে বলেছিলাম আমি। এ ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ করে ১৯৬৪ সালে এক দুর্ঘটনায় আম্মা মারা যান। সে আর এক কাহিনী। আম্মার মৃত্যু সমস্ত কুমিল্লায় এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ডাক্তারের খামখেয়ালী ও গাফিলতিতে ঘটেছিল সে দুর্ঘটনা। Expired date এর পেনিসিলিন ইনজেকশান দেয়ায় Reaction এ মারা যান



www.nagorikpathagar.org

তিনি। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আজ মুমূর্ষু অবস্থায় আমি যখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছি ঠিক তখন তিনি এসে ডাক্তার সাহেবের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমায় আশ্বাস দিয়ে গেলেন। কি আশ্চর্য্য।

তার আশ্বাসবাণীতে আমার মনোবল অনেক বেড়ে গেল। কেমন যেন একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল আমি কিছুতেই এভাবে মরতে পারি না। আমাকে বাচঁতে হবে। আমি বাচঁবোই। মৃত্যুর মুখোমুখি যমে-মানুষে টানাটানির মধ্যে একসময় পথ ফুরিয়ে এল। পৌছে গেলাম মাসিমপুর সিএমএইচ। পূর্বেই খবর দেয়া ছিল। লোকাল ভারতীয় বাহিনীর counterpart ব্রিগেডিয়ার ভড়কে ও সিএমএইচ-এর পদস্থ কর্তাব্যক্তিরা সবাই আমার আগমণ প্রতিক্ষায় তৈরি ছিলেন। আমরা পৌছার সাথে সাথেই সোজা আমাকে নিয়ে যাওয়া হল অপারেশন থিয়েটারে। এ্যানেস্থেসিয়ার প্রভাবে জ্ঞান হারালাম আমি। যখন জ্ঞান ফিরল তখন আমি হাসপাতালের VIP কেবিনে। আমাকে ঘিরে দাড়িয়ে আছে বাবু, আতিক, খোকন, মাসুক, ফারুক, মাহবুব, জহির, ফ্ল্যাইট ল্যাফট্যানান্ট কাদের প্রমুখ, আমার প্রিয় সহযোদ্ধারা। জ্ঞান ফেরার সংবাদ পেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পৌছালেন মেজর দত্ত, ক্যাপ্টেন রব, মেজর দাস, ব্রিগেডিয়ার ভড়কে, ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী, কর্নেল বাগচী প্রমুখ। এরা সবাই আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাদের আন্তরিকতার প্লাবনে সেদিন বিদেশের মাটিতে আত্মীয়-পরিজনহীন অবস্থায়ও নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব বোধ করিনি এতটুকুও। আহত হয়ে হাসপাতালে থাকাকালীন অবস্থায় শ্রীমতী ভড়কের কাছ থেকে পেয়েছিলাম মাতৃসুলভ মমতা আর বাৎসল্য। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার হাসপাতালের ক্যাবিনটাই হয়ে উঠেছিল অপারেশন হেডকোয়ার্টার্স। সেখান থেকে বিছানায় আধশোয়া অবস্থাতেই পরিচালনা করতে হচ্ছিল বিভিন্ন সাব-সেক্টরের যুদ্ধ প্রক্রিয়া।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে কিছুটা সুস্থ্য হয়েই হাতের প্লাষ্টার নিয়ে ফিরে গিয়েছিলাম রনাঙ্গনে। মনে তখন একই চিন্তা, একই ধ্যান- যুদ্ধকে এগিয়ে নিতে হবে দ্রুতগতিতে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছিনিয়ে আনতে হবে স্বাধীনতার সূর্য। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ। এটাই ছিল '৭১ এর চেতনা।



www.nagorikpathagar.org

# সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com

## লেখকের প্রশ্ন

আজ জীবনের পড়ন্তবেলায় নিজেকে জিজ্ঞেস করি; জিজ্ঞেস করি সেই সব সহযোদ্ধাদের; যারা আজো বেঁচে আছে- কোথায় সেই চেতনা? যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশব্যাপি ছড়িয়ে দিয়েছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। পর্যায়ক্রমে সেই স্ফুলিঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল যুদ্ধের দাবানল। যার উত্তাপে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল ৯৭ হাজার সুশিক্ষিত হানাদার বাহিনী। আজ কি তারা পারে না সে দাবানল সৃষ্টি করতে আর একবার? যার প্রচণ্ড উত্তাপে জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সব চক্রান্তের জাল; অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি ও স্বার্থপরতায় কলুশিত বর্তমানের ঘুণেধরা সমাজ ব্যবস্থা? অবসান ঘটবে অতীত ব্যর্থতার ধারাবাহিকতার? বর্তমান প্রজন্মের সম্মুখে অন্ধকার অমানিশার পরিবর্তে উম্মোচিত করে দিতে সম্ভাবনাময় সমৃদ্ধশালী এক নতুন বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যত?

নিশ্চয়ই আজো ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমাদের সবার বিবেকের কোন প্রকোষ্ঠে। খুঁজে নিতে হবে সেই স্ফুলিঙ্গকে; ফিরে পেতে হবে সেই চেতনা; জাগিয়ে তুলতে হবে সুপ্ত শক্তিকে; ছড়িয়ে দিতে হবে দাবানল '৭১ এর স্বাধীনতার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন জাতীয় মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে। যথাযথ মর্যাদায় বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সুখী সমৃদ্ধশালী এক নতুন বাংলাদেশ। এ গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের প্রধান শক্তি বর্তমান প্রজন্ম। '৭১ এর মুক্তিযোদ্ধারা হতে পারে এ সংগ্রামে পথ প্রদর্শক - কাণ্ডারী।

রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্নেল (অবঃ)
শরিফুল হক ডালিম (বীর উত্তম)